সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

এপ্রিল ২০১৫

রবীন্দ্রভাবনায় বৈশাখ...

৬ এপ্রিল ২০১৫ গণভবনে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের সচিব (বহুমুখী অর্থনৈতিক সম্পর্ক) সুজাতা মেহতার সৌজন্য সাক্ষাৎ

৬ এপ্রিল ২০১৫ অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গে ভারতের সচিব (বহুমুখী অর্থনৈতিক সম্পর্ক) সুজাতা মেহতার সৌজন্য সাক্ষাৎ

২২ মার্চ ২০১৫ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে ভারত ও বাংলাদেশের নারকোটিকস নিয়ন্ত্রণবিষয়ক ৪র্থ মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠক

৯ এপ্রিল ২০১৫ জাতীয় প্রেস ক্লাবে ডিক্যাব (ডিপোম্যাটিক করেসপন্ডেন্টস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ)এর সদস্যদের সঙ্গে ভারতের মাননীয় হাই কমিশনার পঙ্কজ সরন

২২২৪ মার্চ ২০১৫ আইজিসিসি মিলনায়তনে বাংলাদেশ সফররত ভারতের বিশেষ শিশু প্রতিনিধিদল

১ এপ্রিল ২০১৫ টাঙ্গাইলের ভাসানী হলে কলকাতার *মঞ্জির*এর *স্বাধীনতা সংগ্রাম* শীর্ষক গীতিনৃত্যালেখ্যর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদ প্রশাসক ফজলুর রহমান খান ফারুক

১০ এপ্রিল ২০১৫ ঢাকার অফিসার্স ক্লাবে *বাঁদী-বান্দার রূপকথা* মঞ্চায়ন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ তেতালিস্নশ | সংখ্যা ০৪ | চৈত্র ১৪২১ বৈশাখ ১৪২২ | এপ্রিল ২০১৫

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা ওয়েবসাইট: www.hcidhaka.gov.in; লাইক ও ভিজিট করুন আমাদের Facebook page: /IndiaInBangladesh
লাইক ও ভিজিট করুন ভারত বিচিত্রা Facebook page: /IndiaInBangladeshBharatBichitra
লাইক ও ভিজিট করুন ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একাউন্ট: Igcc Dhaka, Follow us on twitter /ihcdhaka

আইটেক শিক্ষাসফর

মাটি কে রং

সূচিপত্র

রবীন্দ্রভাবনায় বৈশাখ ০৪
কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা ও পশ্চিমবঙ্গের লিটলম্যাগ আন্দোলন ০৭
ছোটগল্প: ত্মর {পকথা ০৯
আইটেক শিক্ষাসফর ও তাজমহল দেখার অপূর্ব অভিজ্ঞতা ১২
আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ১৬
অনুবাদ গল্প: অমরলতা ১৮
কবিতা ২৪
ছোটগল্প: দ্বিতীয় মুখ ২৬
ধারাবাহিক: নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময় ৩১
বিস্মৃতপ্রায় বিজ্ঞানী রাজচন্দ্র বসু ৩৫
রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প ৩৮
নাগাল্যান্ডে সঙ্গীতানুষ্ঠান মাটি কে রং ৪২
ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৪৪
রবীন্দ্রসত ƒজিৎ মেলবন্ধন ৪৫
শেষ পাতা: রাজশেখর বসু ৪৮

০৪

রবীন্দ্রভাবনায় বৈশাখ

ঋতু পর্যায়ে দাবদাহ বৈশাখ গ্রীষ্ম শুরুর প্রথম মাস। প্রখর তপনের উত্তাপ, এই সময়ে অবিরাম বর্ষণ করে অগ্নিবাণ। শুষ্ক শীর্ণ হয়ে ওঠে প্রকৃতির চেহারা। কাঠফাটা রোদ্দুরে মাঠঘাট ফেটে চৌচির। ঝাঁ ঝাঁ করে চারিধার। ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে একটানা ক্লান্তির বিষণ্নতা। নিকুঞ্জের আধেকস্ফুট পুষ্পরাশি তৃষ্ণায় ঝরে পড়ছে বৃন্তচ্যুত হয়ে। বিশ্বচরাচর জুড়ে এক নিবিড় বৈরাগ্যের ছায়ামূর্তি যেন বন্ধন মুক্তির আকুতিতে নিয়ত উদ্দাম, দিশেহারা। তাই তার বাইরের রূপে লাবণ্যহীন রুদ্রতা। কালবৈশাখীর প্রমত্ততায় অনাসক্তির দীক্ষা তার অন্তর জুড়ে। সাধারণত গ্রীষ্মকালের প্রকৃতিতে এমন একটি নিদাঘ চেহারাই আমাদের বাইরে থেকে চোখে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা বৈশাখের এই চিরপরিচিত রূপকে অবলম্বন করেই তার নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে 'বৈশাখ' কবিতায় সৃষ্টি করেছে গ্রীষ্ম প্রকৃতির ব্যক্তিগত রূপ, মন এবং মেজাজ।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৭৭, ৯৮৮৮৭৮৯৯১ এ ক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮০২৯৮৮২৫৫ ৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান১ ঢাকা১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

উৎসাহিত করে

প্রফেসর সানাউল্লাহ্এর নেতৃত্বে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত পাবনা সমিতি ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় এবং স্বাধীনতার পর থেকে সমিতিতে ক্ষুদ্র পরিসরে লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সম্প্রতি পাবনা সমিতির নিজস্ব ভবন নির্মাণের ফলে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা গড়ার বাস্তবতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। একটি উপযোগী লাইব্রেরির জন্য নিজস্ব জায়গা প্রথম শর্ত। আমরা প্রফেসর সানাউল্লাহর নামে নতুন উদ্যমে 'প্রফেসর সানাউল্লাহ গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'র কাজ শুরু করেছি।

*ভারত বিচিত্রা*র সৌজন্য সংখ্যা নিয়মিতভাবে আমাদের প্রদান করা হলে এটি আমাদের লাইব্রেরিতে সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে পাবনা সমিতির সদস্যদের সঙ্গেও নিয়মিত সংযোগের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠবে।

প্রফেসর সানাউল্লাহ গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় আপনার প্রকাশনা উপহার দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করে বাধিত করবেন, এই আমাদের প্রত্যাশা।

জাহাঙ্গীর আলম মুকুল সদস্য সচিব
প্রফেসর সানাউল্লাহ গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা এবং
সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
পাবনা সমিতি, ঢাকা

মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা আগস্ট ২০১৪ সংখ্যাটি অন্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পড়েছি। স্বাধীনতার প্রথম প্রহরের চিত্রগুলো খুবই ভাল লেগেছে। নজরুলের শ্বশ্রূমাতা গিরিবালা দেবীর গভীর মমতা, জাতপাত ধর্মবর্ণ বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে নজরুলের কাছে কন্যা সম্প্রদান করে বিশ্বমানবতার প্রতীক হওয়া, অসমসাহসিনী নজরুলপত্নী মীলার অসুস্থতার সময়ে নিজেকে উজাড় করে সেবা করা গিরিবালা দেবীর প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালবাসা ও মমত্ববোধ জাগিয়েছে। বিনম্রচিত্তে ওঁর প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সেই সঙ্গে নানা জনের বিভিন্ন সমালোচনা সহ্য করে চিরদিনের মত কলকাতায় রাস্তায় হারিয়ে যাওয়ার কথাটি পড়ে খুবই কষ্ট পেয়েছি। উনি স্বর্গবাসী হোন এই কামনা করি। অন্যান্য লেখা ও চিত্রগুলোও ভাল লেগেছে।

পরিশেষে দুঃখ করে বলতে চাই, সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত পড়ার জন্য ও আমার ঠিকানায় পাওয়ার জন্য আপনার বরাবরে ২০১১ সালে একবার আবেদন করি। আবেদনটি আপনার বরাবরে পৌঁছেছে– তার প্রমাণ অক্টোবর নভেম্বর ২০১১ সংখ্যার 'পাঠকের পাতা' কলামে 'আগ্রহ প্রকাশ' শিরোনামে পত্রটির প্রকাশ। এরপর কয়েকমাস অপেক্ষার পর আপনার কাছে আবার পত্র লিখি কিন্তু কোন সাড়া পাইনি। এবার আগস্ট ২০১৪ সংখ্যাটি পড়ে আপনার কাছে আবার *ভারত বিচিত্রা* পাওয়ার আবেদনটি পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি। অন্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এবং ধার করে যাতে পড়তে না হয় এবং নিজের সংগ্রহশালায় যাতে ম্যাগাজিনটি সযত্নে রাখতে পারি, ভবিষ্যৎ উত্তরসূরিরা যাতে এ থেকে জ্ঞান ও শিক্ষা নিতে পারে এবং ভারতের প্রতি সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ যুগযুগ যেন অটুট থাকে এই কামনা করি। ভারতীয় জনগণ ও *ভারত বিচিত্রা*র মঙ্গল কামনা করে এবং ভবিষ্যতে আরো লেখার ইচ্ছা পোষণ করে আজকের মত এখানেই বিদায় নিলাম।

আলী আসগর সহকারী শিক্ষক (অব.)
ডাক: হোসেন্দী, উপজেলা: পাকুন্দিয়া
কিশোরগঞ্জ২৩২৬

পাঠ অভিজ্ঞতা ও কিছু কথা

ভারত বিচিত্রা সেপ্টেম্বর ২০১৪র 'পাঠকের পাতা'য় 'বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কার এবং বিক্রমপুর' শিরোনামে একটি তথ্যসমৃদ্ধ লেখা পড়লাম। লেখক সমীররঞ্জন শীলকে ধন্যবাদ। ভারতীয় উপমহাদেশে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব অথচ তাঁর দর্শন এখানেই যেন সবচেয়ে উপেক্ষিত। মহাস্থানগড়সহ উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে বৌদ্ধবিহারের কথা জানা যায়। ভারতের লৌহ সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন চর্চার যে প্রসার ঘটেছিল যুগপরি ক্রমায় তার ধ্বংসাবশেষ আজও আবিষ্কৃত হচ্ছে।

সমীররঞ্জন শীল যথার্থই বলেছেন, বৌদ্ধ ধর্মের মানবতাবাদ, সর্ব প্রাণে দয়া এবং অহিংসনীতি বর্তমান বিশ্বে হিংস্রতা ও বিদ্বেষের অবসান ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে নতুন পথের দিশা দেখাতে পারে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রশ্নে অহিংস পথ অবলম্বনের কোন বিকল্প নেই। পৃথিবীর দেশে দেশে নানা সংঘর্ষ, ধর্ম রাজনীতি ক্ষমতা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নিরীহ মানুষ হত্যা বিশেষ করে নারী ও শিশুর রক্তে পৃথিবীর মাটি রঞ্জিত হচ্ছে। আজ একদিকে সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত, অন্য দিকে ধর্মের নামে হত্যার খেলা। উগ্র অসহিষ্ণুতা আর সাম্প্রদায়িকতা বর্তমান বিশ্বে এক প্রকট রূপ ধারণ করেছে। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে উগ্র ধর্মান্ধদের উত্থান, জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদের যে অপচিত্র প্রকটিত হয়ে উঠছে, তাতে শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে শংকিত। কোন ধর্মই প্রকৃতপক্ষে অশান্তি, যুদ্ধ বিগ্রহ ও হত্যাকে সমর্থন করে না। বুদ্ধের অহিংস মতবাদ– 'বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হোক।' স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেই জন সেবিছে

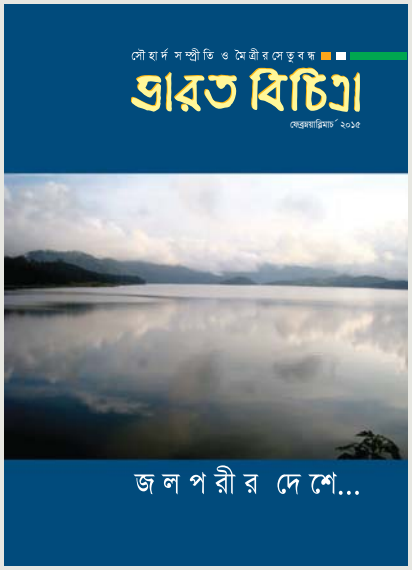

ঈশ্বর।' মোহাম্মদ (স.)এর বাণী: 'সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর পরিবার, কারণ ইহাকে তিনিই প্রতিপালন করেন, অতএব সেই ব্যক্তি আলস্নাহর সর্বাধিক প্রিয় পাত্র যে আলস্নাহর পরিবারের মঙ্গল সাধন করে।' [বাণী ২৮৬– রাসুলুল্লাহ (সা.)এর বাণী আল্লামা স্যার আব্দুল্লাহ আল্লমামুন আল্লসু হরাওয়ার্দী] তাহলে এই দাঁড়ায়, সকল ধর্ম ও ধর্মাবতার শান্তি এবং মানব কল্যাণের পক্ষে কথা বলেছেন। শুধু যে ধর্মের নামে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে ব্যাপারটি তেমন নয়। ক্ষমতা, প্রাচুর্য, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতি ও সম্প্রসারণবাদী মানসিকতা ইত্যাদি আজ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি বিঘ্নিত হবার অন্যতম কারণ। সত্য এবং সুন্দরের জয় চির কালীন। সকলের মনে শুভ বোধের উদয় হোক। দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হোক শান্তি ও কল্যাণের অমোঘ বাণী। মানুষের মঙ্গলময় পদযাত্রা অব্যাহত থাকুক।

মামুন খান
৪৩৭/২ বড় মগবাজার, ঢাকা১২১৭

শুধুই ভারত বিচিত্রা

আমি চট্টগ্রাম মহানগরীর দেবপাহাড়স্থ পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার পরিচালনা কমিটির সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং উল্লিখিত বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক প্রধান বৌদ্ধ ভিক্ষু।
আমি নিয়মিত ভারত বিচিত্রা পড়তে চাই। ভারত এবং বাঙালির বিভিন্ন কীর্তিগাথা ও সাহিত্যিক রস পরিবেশনে ভারত বিচিত্রার তুলনা শুধুই ভারত বিচিত্রা।
নিম্ন ঠিকানায় পত্রিকাটি পাঠানোর ব্যবস্থা নিলে আমাদের জ্ঞানঋদ্ধ হবার সুযোগ যেমন বাড়বে তেমনি আপনারাও আমাদের মনোমন্দিরে চির অম্লান হয়ে থাকবেন।

এস জ্ঞানমিত্র ভিক্ষু (নিপুণ বড়ুয়া)
পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার
৯৬/এ, কলেজ রোড, দেবপাহাড়

শুভ জন্মদিন...

চলে যায় বসন্তের দিন চলে যায়... অনেকটা সেই কবিতার মত আক্ষেপ রেখে, মাধবী এসেই বলে যাই... বসন্তের ক্ষণস্থায়ী যৌবন বিদায় নিতেই প্রখর তপনতাপে প্রকৃতিতে ফুটে ওঠে জীর্ণতা, ম্লানতা। সেই গ্লানিরও একসময় অবসান ঘটে। তারপর এক একটা দিন অন্যরকম। মেঘের পর মেঘ জমতে থাকে ঈশানকোণে। খ্যাপা ভৈরবের মত বিষাণ বাজিয়ে মেঘের ডম্বরুর সঙ্গে প্রলয় নাচনে দশদিক আচ্ছন্ন করে দিনশেষে ঝাঁপিয়ে পড়ে কালবোশেখী। সন্ধ্যায় মরণ ছোবলে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে তার বিদায়ের পরে আকাশে তারা ফোটে। ক্ষণকাল আগের রুদ্ররূপের কিছুমাত্র যেন মনে থাকে না প্রকৃতির। পত্রপল্লবে প্রাণের উৎসব লেগে যায়...

বর্ষপরিক্রমায় এমনি করে দিন আসে দিন যায়। প্রাচ্যে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দিনের সূচনা। দিন শেষে সূর্য যখন পাটে যায়, রাত নেমে আসে, তখন মধ্যপ্রাচ্যে নতুন দিনের সূচনা হয়। আবার রাত্রিনিশীথে প্রতীচ্যে নতুন দিনগণনা শুরু হয়।

দিনগণনার কথা যখন এলই, তখন কাব্যিকথা রেখে বরং সরাসরি কাজের কথায় আসি। সম্প্রতি 'হিস্ট্রি অফ দ্য প্রেস ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি বই আমাদের হাতে এসেছে, যেখানে প্রবীণ সাংবাদিক ও ব্যবহারজীবী মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া রীতিমত তথ্যউপা ত্ত দিয়ে জানাচ্ছেন *ভারত বিচিত্রার* জন্ম ১৯৭৩ সালে। তিনি লিখছেন, 'The ninth issue of the 1st year appeard in 30th September 1973'। অর্থাৎ *ভারত বিচিত্রার* প্রথম বছরের নবম সংখ্যাটি মুদ্রিত হয় ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে, পত্রিকাটির জন্ম ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে। সেই সুবাদে পত্রিকাটির বয়স পূর্বতন হিসেবের চেয়ে এক বছর চার মাস বেড়ে গেল। দাপ্তরিক নথিপত্র দেখে আমরা এর জন্মমাস মেনে নিয়েছিলাম ১৯৭৪ সালের এপ্রিল। তবে পুরনো *ভারত বিচিত্রায়* মুদ্রিত তারিখ থেকে হিসেব করলে জন্মমাস দাঁড়ায় ১৯৭৩ সালের জুন মাস। কিন্তু গোলাম কিবরিয়া সাহেব যেহেতু একটি বৃহদাকার বই লিখে পত্রিকাটির জন্মতারিখ উদ্ঘাটন করেছেন, কাজেই এটিকেই সর্বাধিক প্রামাণিক বলে ধরে নিলে সব বিভ্রমের অবসান ঘটবে বলে মনে করি।

ভারত বিচিত্রা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন এবং একমাত্র নিয়মিত মাসিক পত্রিকা যার প্রচার সংখ্যা কুড়ি হাজার। বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজের কাছে আধুনিক ভারতকে যথাযথভাবে উপস্থাপনের এই কর্মযজ্ঞে সর্বদা পাশে থাকার জন্য *ভারত বিচিত্রার* অগণিত পাঠক্ত শুভানুধ্যায়ীকে শুভেচ্ছা জানাই। নতুন বছরের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। স্বাগত ১৪২২ বঙ্গাব্দ। নতুন বছরে সকলের জীবন সুখসম ৃদ্ধি ও আনন্দে ভরে উঠুক, এই কামনা।

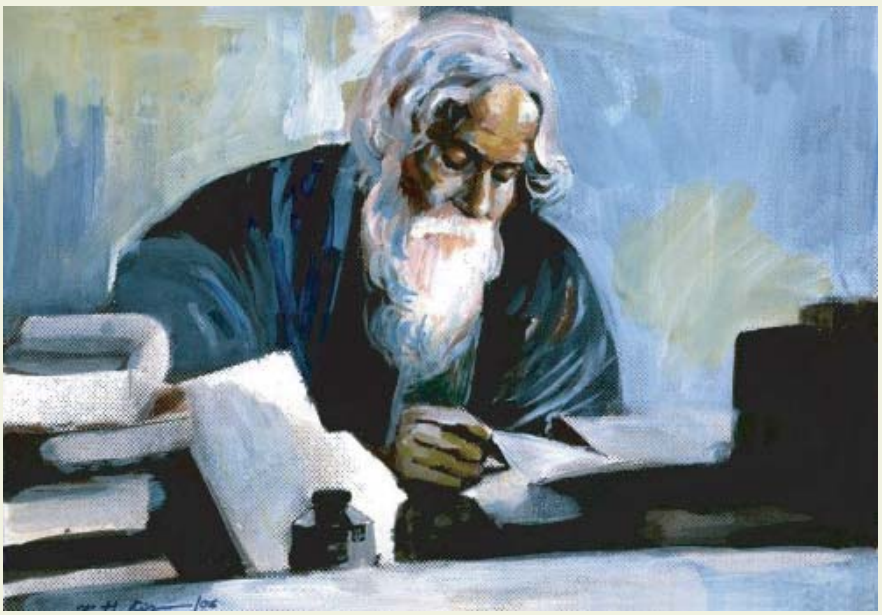

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রভাবনায় বৈশাখ

দীপিকা ঘোষ

ঋতু পর্যায়ে দাবদাহ বৈশাখ গ্রীষ্ম শুরুর প্রথম মাস। প্রখর তপনের উত্তাপ, এই সময়ে অবিরাম বর্ষণ করে অগ্নিবাণ। শুষ্ক শীর্ণ হয়ে ওঠে প্রকৃতির চেহারা। কাঠফাটা রোদ্দুরে মাঠঘাট ফেটে চৌচির। ঝাঁ ঝাঁ করে চারিধার। ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে একটানা ক্লান্তির বিষণ্ণতা। নিকুঞ্জের আধেকস্ফুট পুষ্পরাশি তৃষ্ণায় ঝরে পড়ছে বৃন্তচ্যুত হয়ে। বিশ্বচরাচর জুড়ে এক নিবিড় বৈরাগ্যের ছায়ামূর্তি যেন বন্ধন মুক্তির আকুতিতে নিয়ত উদ্দাম, দিশেহারা। তাই তার বাইরের রূপে লাবণ্যহীন রুদ্রতা। কালবৈশাখীর প্রমত্ততায় অনাসক্তির দীক্ষা তার অন্তর জুড়ে। সাধারণত গ্রীষ্মকালের প্রকৃতিতে এমন একটি নিদাঘ চেহারাই আমাদের বাইরে থেকে চোখে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা বৈশাখের এই চিরপরিচিত রূপকে অবলম্বন করেই তার নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে 'বৈশাখ' কবিতায় সৃষ্টি করেছে গ্রীষ্ম প্রকৃতির ব্যক্তিগত রূপ, মন এবং মেজাজ। বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির চরিত্রে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব আরোপ তাঁর প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাতে মূর্ত হয়ে উঠলেও এই কবিতায় সেই আবেদন একেবারেই অন্যরকম। মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির চরিত্রের সম্মিলন ঘটিয়ে মানবপ্রকৃতি এবং নিসর্গপ্রকৃতিকে একাকার করে দেওয়াও রবীন্দ্ররচনার অজস্র নিসর্গভিত্তিক কবিতার একটি সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব। কিন্তু তারপরেও এ কথা বলা চলে, শব্দ ব্যবহারের অপরূপ তাৎপর্যে বৈশাখের প্রকৃতি কেবল ব্যক্তিত্বের ছায়া হয়ে নয়, এই কবিতায় একেবারে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে সর্বত্যাগী শ্মশানচারী, তেজোদৃপ্ত মহাযোগী রুদ্রনাথের মত। যিনি জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার প্রতি একান্ত ভ্রূক্ষেপহীন, নিরাসক্তির নিষ্ঠুরতাই যাঁর স্বভাবধর্ম।

কিন্তু তবুও তিনি নতুন সৃষ্টির অমরাবতীতে কল্যাণদূত। 'বৈশাখ' কবিতায় গ্রীষ্মের প্রখরদীপ্ত প্রকৃতির চরিত্রে চিরন্তন সন্ন্যাসীর এই প্রকৃতি আর চেহারাকেই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষরূপ দান করেছেন শব্দ প্রয়োগের অসাধারণ সার্থকতায়।

এই কবিতায় দাবদাহ বৈশাখ জীবনের সুখদুঃখ, আশা-নিরাশার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে ধূলিধূসরিত গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল উড়িয়ে, জলহীন নদীতীরের পথে পথে, শস্যশূন্য তৃষ্ণার্ত মাঠের মাঝ দিয়ে রুদ্র সন্ন্যাসীর বেশে যখন উদার উদাসভাবে ছুটে চলে যায় কাল বৈশাখীর ভয়াবহ রূপ ধরে, তখন তার উন্মত্ত পদক্ষেপের বজ্রধ্বনি যেন আমাদের কানেও ভেসে আসে। কবিতা পড়তে গিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ের উগ্র বেগ স্পর্শ করে পাঠকের স্পর্শেন্দ্রিয়কে। পাঠক স্পষ্ট দেখতে পান, হঠাৎ মধ্যদিনের নীরবতা ছিন্ন করে সবকিছু ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিতে দিতে কালবৈশাখী, ব্যক্তিমানুষের মতই স্পষ্ট অবয়ব নিয়ে শক্তিমত্ততায় ছুটে চলেছে চারিদিককে অগ্রাহ্য করে। আকাশের বহ্নিদীপ্ত বিদ্যুৎরেখা হয়ে সশব্দে থেকে থেকে সে ফেটে পড়ছে মহাদেবের ভয়াল, বিষম বিষাণের মত। কবি তাই বৈশাখের প্রমত্ত হয়ে ছুটে চলার মাঝখানে যখন তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চান–

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক–
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ?

তখন আমাদের মানসচোখ ক্রমাগত আকর্ষণ নিয়ে এক পার্থিব সন্ন্যাসীকেই চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করে। এ রকম ভাবতে আমরা বিস্মৃত হয়ে পড়ি যে, এই ভৈরব কোন রক্তমাংসের প্রাণময় মানবদেহের নয়। সে জড়প্রকৃতির একটি চেতনাময় রূপকল্পনা। মহাকবি যাকে মহাকাল মহেন্দ্রর সঙ্গে তুলনা করে তার মুখে তুলে দিয়েছেন ভয়াল বিষাণ। যে বিষাণ বাজিয়ে ধ্বংসের উৎসবে মত্ত হয়ে নতুন সৃষ্টির উলাসে মহাযোগী ভোলানাথের মতই সে মেতে উঠতে চাইছে প্রলয়নাচনের ধ্বংসনেশায়। তা-ব নৃত্যের ছন্দে ছন্দে ছিঁড়ে ফেলছে পুরনো সৃষ্টিরগানিমাকে। সূর্যের উত্তাপ ধারণ করে দীর্ঘ তপস্যার কৃচ্ছ্রসাধনে তার রুক্ষ ক্ষীণ শরীর হয়ে উঠেছে তেজোময়। বৃষ্টিহীন খরতাপের ঊষরতায় তাম্রাভ তার দেহ। আর রুদ্র ঝড়ের হাওয়ার বেগে উড়ে চলেছে তার পিঙ্গল জটাজাল।

উপমার ;পকের অনন্য মহিমায়, অসাধারণ শব্দব্যঞ্জনার রসঘনতায় গ্রীষ্ম ঋতুর শুষ্ক তপ্ত চেহারায় মানবমূর্তি স্থাপন করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কারুকাজ, সাহিত্যের ইতিহাসে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত যা পড়তে পড়তে কল্পনা বাস্তবের সীমারেখা ছাড়িয়ে পাঠকের মন কেবলই উড়ে চলে যায় ক্লান্তিহীন শীর্ণ সন্ন্যাসীর পথরেখা লক্ষ্য করে। কিন্তু শব্দের সমাহারে মূর্তি গড়ে কেবল প্রাণপ্রতিষ্ঠাই নয়, রুদ্র সন্ন্যাসীর নির্মোহ নিরাসক্ত চরিত্রকেও দৃশ্যযোগ্য ছবির মতই এই

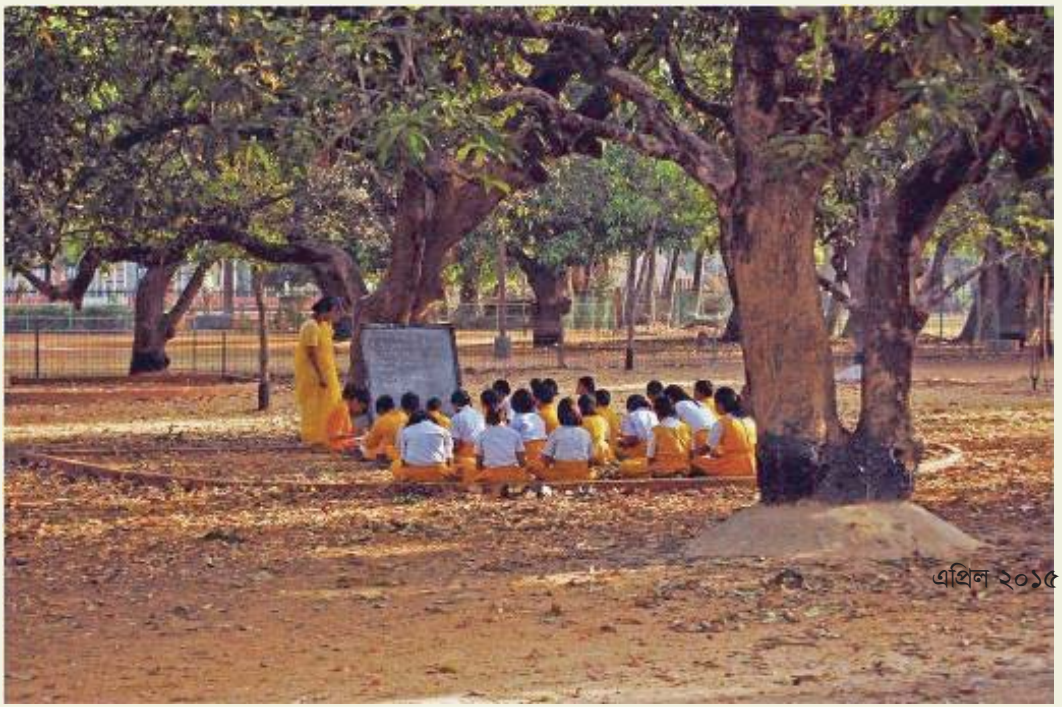

উপমা-রূপকের অনন্য মহিমায়, অসাধারণ শব্দব্যঞ্জনার রসঘনতায় গ্রীষ্ম ঋতুর শুষ্ক তপ্ত চেহারায় মানবমূর্তি স্থাপন করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কারুকাজ, সাহিত্যের ইতিহাসে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। যা পড়তে পড়তে কল্পনা বাস্তবের সীমারেখা ছাড়িয়ে পাঠকের মন কেবলই উড়ে চলে যায় ক্লান্তিহীন শীর্ণ সন্ন্যাসীর পথরেখা লক্ষ্য করে। কিন্তু শব্দের সমাহারে মূর্তি গড়ে কেবল প্রাণপ্রতিষ্ঠাই নয়, রুদ্র সন্ন্যাসীর নির্মোহ নিরাসক্ত চরিত্রকেও দৃশ্যযোগ্য ছবির মতই এই 'বৈশাখ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণ যত্ন করে।

'বৈশাখ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণ যত্ন করে। রুদ্র ভৈরবের অমিত শক্তির তেজ বিচ্ছুরণ, যুক্তব্যঞ্জনের শব্দ ঘর্ষণে যেমন জ্বলে উঠতে চেয়েছে কবিতার ছত্রে ছত্রে, তেমনি প্রখর সূর্যের উত্তপ্ত দহনে অগ্নিময় হয়ে উঠেছে চারিদিক। মনে হয়, লোলুপ চিতার আগুনই যেন ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বচরাচর পরিব্যাপ্ত করে। যে চিতাগ্নির ভস্ম গায়ে মেখে দীপ্তচক্ষু মহাকাল শিব, তাঁর ভয়াল বিষাণ বাজিয়ে মত্ত হয়ে ওঠেন প্রলয় নাচনের ছন্দে। যে চিতাগ্নি শিখার স্পর্শ লেগে জ্বলে যায় জীবন জগতের সব রকম প্রাচীন জীর্ণতা–

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর–
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার–
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।

তবে 'বৈশাখ' রবীন্দ্রনাথের এমন একটি কবিতা যেখানে কেবল বৈশাখের রুদ্র প্রকৃতি কিংবা রূপের বর্ণনা নয়, গভীর মননশীলতায় কবি জগৎ ও জীবনের এক অতলস্পর্শ তাত্ত্বিক সত্যকে মহাকাল রুদ্রের প্রতীকে উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। এই সত্য হল, জগৎ নিত্যকাল ধরে জাগতিক সব পুরাতনকেই পেছনে ফেলে ক্রমাগত নতুনকে আনন্দের অনুভূতিতে আহ্বান করে ফিরছে। প্রাচীনকে, পুরাতনকে মায়ামোহ বন্ধনে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকলে মানবজীবনে কেবলই জমে উঠবে জরা, অশুচি আর চিন্তা-চেতনায় বদ্ধতার নিষ্ফলতা। কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির অংশ হিসেবে মানুষের জীবনপ্রবাহের রুদ্ধ হয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। স্রোতস্বিনী চঞ্চলা নদীর মত প্রবহমানতাই জীবনের একমাত্র সত্য। তাতেই আসে জগতের কল্যাণ। শুধু গ্রহণ নয়, নয় কেবল সঞ্চয়। মোহমুক্ত হয়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত ত্যাগ করারও প্রয়োজন রয়েছে জীবনে। কারণ জগৎ সৃষ্টির সবখানেই গ্রহণ এবং বর্জন এই দ্বৈত নিয়মের আইন। ভাঙা এবং গড়া সৃষ্টির দুই বিশিষ্ট নিয়ম। কিন্তু ধ্বংস আর সৃষ্টি পরস্পরবিরোধী নয়, জগতের বিচিত্র লীলার মধ্যে নিয়তই তারা যুক্ত হয়ে আছে। কবি তাই বলেছেন–

হে বৈরাগী, করো শান্তি পাঠ
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে–
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে
পূর্ণ করি মাঠ–
হে বৈরাগী, করো শান্তি পাঠ।

হে বৈরাগী বৈশাখ, তোমার নিরাসক্ত স্বভাবের রুদ্রতাকে বৈরাগ্যের আবরণ দিয়ে ঊর্ধ্বতল আকাশ থেকে নিম্নে ধরণীতলের সবখানে, এমনকি নরনারীর হৃদয় পর্যন্ত বিস্তৃত করে দাও। তারপরে সবকিছু ধ্বংসের আনন্দ নৃত্যে লণ্ডভণ্ড করতে করতে কল্যাণের শান্তিমন্ত্র পাঠ কর। কারণ অন্তরের শান্তিমন্ত্রে ধ্বংসের মধ্যে জগৎ জুড়ে নতুন সৃষ্টির আবহ জাগে। নতুন চেতনার স্পর্শ লাগায় নতুন সৃষ্টির অলকাপুরী হয়ে ওঠে আমাদের চির পরিচিত ধরণী। পুরাতনের মধ্যে চির নতুনের সুর বারংবার বাজিয়ে তোলা তাই চিরন্তন সন্ন্যাসী ভোলানাথের কাজ। কারণ জগতে যারা ত্যাগ করতে জানে, নতুনের আহ্বান তারাই কেবল শুনতে পায় নিত্যকাল। কালবৈশাখীর ধ্বংসলীলা এই ত্যাগের প্রতীক। তাই সে বয়ে আনে নব বর্ষার সুনির্মল বারিধারা। সে বারিধারায় জগতে জরা, অশুচির অবসান ঘটে। নতুন করে বিকশিত হয় আরেক নতুন সৃষ্টি। বৈশাখ তাই মহেশ্বর শিবের মতই কল্যাণের নিত্য দূত। ধ্বংসের মধ্যেও কবি তাই তার কণ্ঠে শুনতে পান শান্তির কল্যাণমন্ত্র পাঠ।

বৈশাখের চেহারা এবং চরিত্রকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কল্পনামনীষা যেভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে এই কবিতায়, এক কথায় অনবদ্য তার চিত্রকল্প। অনবদ্য তত্ত্বের গভীরতায়; কাব্যের নির্মল সুষমায়; শিল্পসৌকর্যে এবং দার্শনিক ভাবনায়। 'বৈশাখ' সাহিত্য জগতের এক চিরন্তন সম্পদ।

দীপিকা ঘোষ কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক

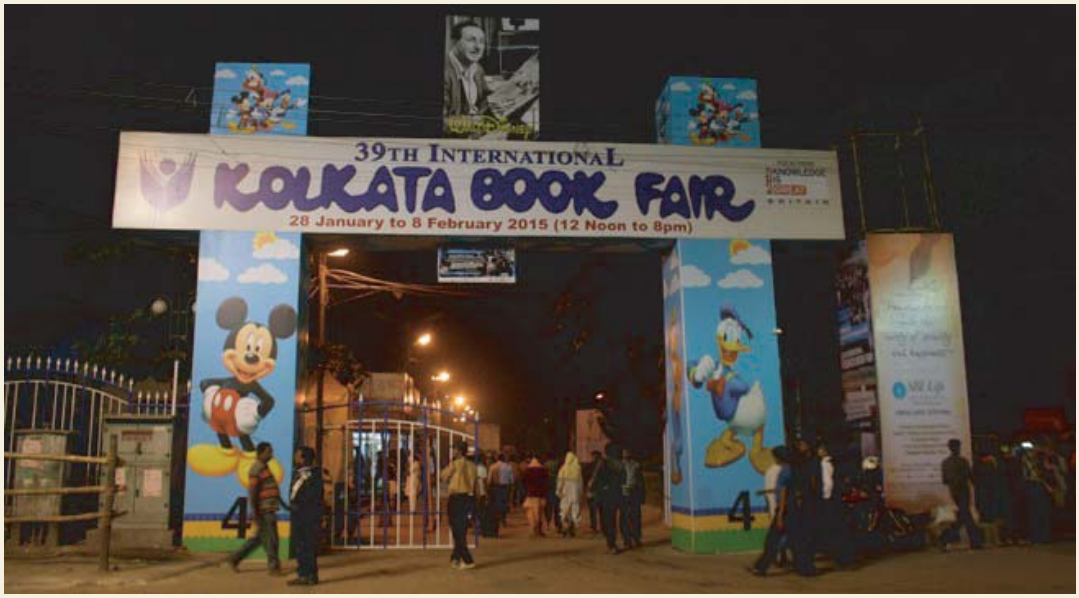

সৌহার্দ

কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা ও পশ্চিমবঙ্গের লিটলম্যাগ আন্দোলন

ইমদাদুল হক সূফী

কলকাতা বইমেলা বিশ্বের অন্যতম একটি বইমেলা। ১৯৭৫ সালে প্রকাশক বিমল ধর ও প্রবীর দাশগুপ্তের উদ্যোগে 'পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরের বছর ১৯৭৬ সালের ৫ মার্চ গিল্ডের উদ্যোগে যাত্রা শুরু করে কলকাতা বইমেলা। শুরুতে বইমেলা ছিল কলকাতার ময়দানে। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, বিশেষ করে ভেন্যু নিয়ে অনেক সমস্যা মোকাবিলা করে ২০০৯ সালে কলকতা বইমেলা বর্তমান ভেন্যু সায়েন্স সিটিসংলগ্ন মিলনমেলা প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কলকাতায় আরো একটি বইমেলা আয়োজিত হত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা' নামে আয়োজন করত সেই মেলাটি। কিন্তু সেই গ্রন্থমেলা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড আয়োজিত কলকাতা বইমেলার মত জনপ্রিয়তা পায়নি। ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে কলকাতায় একটি বইমেলারই আয়োজন হচ্ছে আর সেটি হচ্ছে 'কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা'।

'কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা'য় প্রতিবছর ভারতের কোন একটি রাজ্য বা বহির্বিশ্বের কোন একটি রাষ্ট্রকে 'থিম কান্ট্রি' নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ দু'বার থিম কান্ট্রি হবার সম্মান অর্জন করেছে। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশকে প্রথম থিম কান্ট্রি হিসেবে নির্বাচিত করা হয় এবং সে-বার কবি শামসুর রাহমান মেলার উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয়বার ২০১৩ সালে বাংলাদেশ পুনরায় থিম কান্ট্রি নির্বাচিত হবার গৌরব অর্জন করে। প্রফেসর এমেরিটাস আনিসুজ্জামান মেলার উদ্বোধন করেন।

সম্প্রতি ২৭ জানুয়ারি থেকে ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ১০দিনের ‘কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা২০১৫ ’ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কলকাতার মিলনমেলা প্রাঙ্গণে। ২৭ জানুয়ারি বিকাল ৪.০০টায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি মেলার উদ্বোধন করেন। ২৮ জানুয়ারি থেকে ০৮ ফেব্রুয়ারি বেলা ১.০০টা থেকে রাত ৮.০০টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য মেলা উন্মুক্ত ছিল। সংশিষ্টদের ধারণা, প্রায় ২৫ লাখ বইপ্রেমী মেলায় এসেছিলেন। এ বছর ‘কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা’র থিম কান্ট্রি ছিল গ্রেট ব্রিটেন।

৩০ জানুয়ারি দুপুরে সড়কপথে আমি কলকাতা পৌঁছলাম। কলকাতা এলে মির্জা গালিব স্ট্রিট, সদর স্ট্রিট এলাকার কোন হোটেলেই অবস্থান করি। এই এলাকাটি ধর্মতলা বা এসপ্লানেডের কাছাকাছি। ধর্মতলা থেকে কলকাতার যে কোন প্রান্তে যাতায়াত সহজ।

অনেক খুঁজে বাজেট ও পছন্দমত হোটেলে একটি রুম পেলাম। ক্যাপিটাল হোটেল। রুম ভাড়া ৪৫০ টাকা। রুমে ওঠার পর দুনিয়ার ক্লান্তি এসে দেহে ভর করল। রাতে জার্নি করেছি। উপরন্তু বেনাপোল ও পেট্রাপোল ইমিগ্রেশনকা স্টমসএর নিয়মঅনিয়ম ও দালা লের ঝক্কি-ঝামেলায় পথের ক্লান্তি শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। না, ঘুমানো যাবে না। বইমেলায় যেতে হবে। এমনিতেই এসে পৌঁছতে বিলম্ব হয়ে গেছে। আসার কথা ছিল ২৭ জানুয়ারি আর আজ ৩০ তারিখ। আর দেরি করা যায় না। বেড়িয়ে পড়লাম। প্রথমেই মারকুইস স্ট্রিট ও মির্জা গালিব স্ট্রিট ক্রসিংএর একটি দোকান থেকে মোবাইল ফোনের সিম কিনলাম। যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করলাম কারণ প্রথমবার কলকাতায় এসে সিম কিনতে গিয়ে ঠকেছিলাম। সিমের মূল্য প্রায় ৫০ রুপি, ১০০ রুপি পাওয়ারের জন্য এবং ২০০ রুপি রিচার্জ করতে মোট ৩৫০ রুপি লাগল। সন্ধ্যা ৭.০০টার পর সিম চালু হবে।

পরিচিত একজনকে ফোন করে বইমেলায় সহজে যাবার রাস্তা জেনে নিলাম। ধর্মতলা থেকে মেট্রোতে রবীন্দ্রসদন। রবীন্দ্রসদনের পাশে হলদিরামের পাশ থেকে সায়েন্স সিটিগামী বাসে মিলনমেলা প্রাঙ্গণে অবস্থিত বইমেলায় গেলে অর্থের সাশ্রয় হবে। ভাড়া ট্রামেবা সে মিলিয়ে মাত্র ১০ রুপি। এসি বাসে গেলে ২০ রুপি। ট্যাক্সিতেও যাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ভাড়া ১২৫ থেকে ১৫০ রুপি।

বইমেলায় পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে গেল। রবীন্দ্রসদনে নেমে সায়েন্স সিটির বাস পেতে অনেকটা সময় লেগে গেল। মেলায় পৌঁছলাম সন্ধ্যা ৭.০০টা। পৌঁছেই প্রথমে বাংলাদেশ প্যাভেলিয়নে গেলাম। সেখানে বাংলা একাডেমি, নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রসহ ১৫টি বইয়ের স্টল ও বাংলাদেশ পর্যটনের একটি স্টল দেখলাম। প্যাভেলিয়নে ঢোকার মুহূর্তে নজরুল ইনস্টিটিউটের স্টলের কর্মকর্তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম মেলায় বাংলাদেশ প্যাভেলিয়ন বা বাংলাদেশ থেকে আগত স্টলসংশি ষ্ট বা অতিথিদের সমন্বয়কারী কে? তিনি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টল দেখিয়ে সেখানে কথা বলতে বললেন। সেখানে পরিচয় হল জনাব ফরিদউদ্দিনের সঙ্গে। ফরিদউদ্দিন আমাকে জানালেন, কর্নারের একটি রুমে সংশিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ বসেন। সেখানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক অসীম সাহা, কলকাতা উপদূতাবা সের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচয় হল। সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে মেলা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

বাংলাদেশ প্যাভেলিয়ন থেকে রাত ৮.০০টায় বেরিয়ে লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে গেলাম। মেলা আজকের মত ভেঙে যাচ্ছে। লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক ও প্রকাশকেরাও উঠিউঠি করছেন। এরই মধ্যে একনজর দেখে নিলাম পুরো এলাকাটি। চারিদিক উন্মুক্ত বিশাল প্যাভেলিয়ন। । এর মধ্যে প্রায় শ’পাঁচেক লিটল ম্যাগাজিন স্টল। সবাই একটি করে টেবিল নিয়ে বসেছেন। লিটলম্যাগ চত্বরে এসে পশ্চিমবঙ্গের লিটলম্যাগচর্চা সম্পর্কে লেখিকা নীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, ‘এখানে অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখক-লেখিকা রয়েছেন যাঁরা তাঁদের লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকার চেয়ে লিটলম ্যাগাজিনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।’ তিনি আরো বলেছিলেন, ‘এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দল থেকে পূজাপার্বণে লিটলম ্যাগ প্রকাশিত হয়ে থাকে। একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে, একদল বিশিষ্ট চিকিৎসককে কেন্দ্র করে, এমন কী ট্রেনে নিয়মিত কলকাতা যাতায়াতকারী প্যাসেঞ্জাররাও তাঁদের সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে লিটলম ্যাগ বার করেন।’ তাই কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলায় এসে লিটলম ্যাগ সম্পর্কে কোন খোঁজখবর না নিয়ে ফিরে গেলে মেলায় আসাই বৃথা হয়ে যাবে। এদিকে ঘড়ির কাঁটা জানান দিচ্ছে মেলার সময় শেষের দিকে। আজ সময় শেষ। আগামীকাল এসে ঘুরে ঘুরে দেখব। তবে আজকে দেখা কয়েকটি লিটলম ্যাগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য এখানে দিচ্ছি। স্বল্প সময়ের পর্যবেক্ষণে মেলায় আসা অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে বিস্তারিত বলা কঠিন কাজ। তারপরও কিছু না বললেই নয়। আফিফ ফুয়াদ সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিনের নাম *দিবারাত্রির কাব্য*। বইমেলা সংখ্যাটি বিভূতিভূষণ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। *অশোকনগর* নামে বিভূতিভূষণের জীবন ও কর্মের ওপর আরো একটি ম্যগাজিন ছিল বইমেলায়। *নতুন শতক* ম্যাগাজিনটি বইমেলা সংখ্যার বিষয় করেছে ‘বেশ্যা’। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজকে নিয়ে *বিনির্মাণ* নামে পত্রিকাটি বিশেষ সংখ্যা করেছে। মেলায় আসা একটি গুরুত্বপূর্ণ লিটল ম্যাগাজিন ফারুক আহমেদ সম্পাদিত *উদার আকাশ*। *নৌকো* ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছে বিশেষ কবি ও কবিতা সংখ্যা। *বাতিঘর* ম্যাগাজিনটিও সুন্দর হয়েছে। কবিতা নিয়ে বইমেলা সংখ্যা করেছে *শুধু বিঘে দুই* পত্রিকা। ওরহান পামুককে নিয়ে *সমান্তরাল* বইমেলা সংখ্যা করেছে। আরো দুতিনটি লিটল ম ্যাগ দেখলাম। সুদর্শন সেনশর্মা সম্পাদিত *কারুকথা এই সময়*, রণজিৎ অধিকারী সম্পাদিত *পূর্ব* ও নরেশ মণ্ডল সম্পাদিত *সব্যসাচী*।

লিটলম ্যাগ চত্বর থেকে পাশেই ৪৪৭ নম্বর স্টলে গেলাম। স্টলটি মাসিক *আরম্ভ* সাময়িকীর। সেখানে পরিচয় হল প্রকাশক শ্রী পিনাকী দত্তের সঙ্গে। অমায়িক ভদ্রলোক– প্রথম দেখাতেই আপন করে নেন মানুষকে। এখানে বলে রাখছি তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন আমাদের শিল্পী সুমনা বিশ্বাস। পরিচয় হল *আরম্ভ* সম্পাদক বাহারউদ্দিন ও অন্য অনেকের সঙ্গে। কিছুক্ষণ *আরম্ভর* স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে উপস্থিত কবিসাহিতি ক ও প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করলাম। তাঁদের বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত *দেশ প্রসঙ্গ* দিলাম। তাঁরা সবাই মনোযোগ দিয়ে ম্যাগাজিনটির পাতা উল্টে দেখলেন, প্রশংসা করলেন। ভাল লাগল। *দেশ প্রসঙ্গ* নিয়ে বই মেলায় যোগদানের কষ্ট কিছুটা হলেও কমল। মনে পড়ল আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের কর্মকর্তা ও ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের প্রেস ও মিডিয়া সেকশনের প্রথম সচিবের সহযোগিতার কথা। তাঁদের সহযোগিতা না পেলে সময়মত মেলায় আসতে পারতাম না।

শুক্রবার মেলায় আমার চতুর্থ দিন। শনি ও রবিবার এখানে ছুটির দিন। সবাই আশা করছেন অনেক লোক সমাগম হবে এবং ভাল বিক্রিও হবে। রাত ৯.০০টার দিকে মেলা থেকে হোটেলমুখী হলাম। পিনাকী দত্ত আমাকে তাঁর অ্যাম্বাসেডরে করে সদর স্ট্রিটে আমার হোটেলে পৌঁছে দিলেন।

ইমদাদুল হক সূফী
সম্পাদক, দেশ প্রসঙ্গ

ছোটগল্প

অ-রূপকথা

রাউফুন নাহার

এক.

গ্রামের নাম রূপগাঁ। নামের সঙ্গে অবয়বে দারুণ মিল। রূপগাঁয়ের রূপের প্রধান রহস্য বুকের 'পরে বয়ে চলা ছোট্ট নদী রূপসী। নদীর নামে জনপদটির নাম নাকি জনপদের নামেই নদীর নামকরণ তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। যুগের পরে যুগ চলে যায় আর রূপসীর বুকে জমতে থাকে সহস্র জীবনকাহিনি। সময় বদলায়, মানুষ বদলায়, ভাষা বদলায়, সেই সঙ্গে বদলায় রূপসীর চালচলন। পুরনোরা বহুযুগ আগের গল্প শোনায় নতুনদের। সত্যের সঙ্গে শৈল্পিকভাবে মিশে যায় নানা কল্পনা।

হেফাজত আলীর বাড়িটি রূপসীর ধার ঘেঁষেই। বছরখানেক হল সে পাকা বাড়ি বানিয়েছে। বেশ কিছু জমি-জায়গাও করেছে। জমি চাষের জন্য কিনেছে ট্রাক্টর আর স্যালোমেশিন। রূপগাঁয়ের উঠতি ধনীদের মধ্যে সে অন্যতম। আয়ে তার যতখানি আগ্রহ, ব্যয়ে ঠিক দ্বিগুণ পরিমাণ অনাগ্রহ। বিপদে পড়ে কেউ সাহায্য চাইলে হেফাজত সুকৌশলে নিজের অস্তিত্ব আড়াল করতে চায়। অর্থ,

> মাথায় সুগন্ধি তেল, চোখে হালকা কাজল, আর চাপা রঙের ডুরেশাড়ি গায়ে জড়িয়ে সন্ধেবেলা দোকানে কেরোসিন আনতে যাওয়াটাই আরজুর নিত্যদিনের সবচেয়ে প্রিয় কাজ এখন। এই গাঁয়ের কেবল একটা মানুষই যেন তার কষ্টটা বুঝতে পারে। সম্রাটও প্রতিদিন অপেক্ষা করে আরজুর জন্য। কখনও হাট থেকে আনা একগাছি লাল চুড়ি, কখনো বাতাসা কিংবা গুড়ের জিলিপি হাতে নিয়ে। রূপসীর তীরে ছোট্ট একটি লগ্ন এই দুই মানব-মানবীর জীবনে অদ্ভুত এক উত্তাপ নিয়ে আসে। নিজেদের তারা দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ ভাবতে থাকে।

সময় কিংবা শ্রম কোন কিছু দিয়েই সাহায্য করার কথা মাথায় আনে না। গ্রামের লোকজন তাই আড়ালে তাকে ডাকে হেফা কিপ্টা। চার কন্যা ও এক পুত্রের পিতা হেফাজত কন্যাদের বড় বড় গেরস্ত ঘরে পাত্রস্থ করেছে। অন্যদিকে সদ্য একুশে পা দেওয়া অবিবাহিত একমাত্র পুত্রের বিয়ের বাজার সাধারণ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ এলে হেফাজত দম্ভের সঙ্গে মোটা অঙ্কের যৌতুক দাবি করে। সারাক্ষণ নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হেফাজত কেউ জমি বিক্রি করছে শুনলেই টাকা হাতে প্রাণপণে ছুটে যায়। রূপসীর তীরে বটগাছতলায় যে-সব রসিক লোকজন বিড়ি টানতে টানতে পাশা খেলায় মগ্ন তারা হাঁক ছাড়ে, 'আরে ও ভাইজান, এত সম্পদ বানায় করবেন কি?' হেফাজত এক কথায় উত্তর দেয়, 'ছেলের ভবিষ্যৎ'। আসল কারণ যে অর্থনেশা তা পাশা খেলায় মশগুল লোকগুলোর চেয়ে আর কেই-বা ভাল বলতে পারে! ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আসক্তির বিষয়বস্তু ভিন্ন হয়, কিন্তু উপসর্গগুলো সমগোত্রীয়।

হেফাজতের একমাত্র ছেলে সম্রাটের মতিগতি তার বাবার মত নয়। তার জীবনে কোন ব্যস্ততা নেই। কাজকর্ম তার ভাল লাগে না। যারপরনাই কৃপণ পিতার হাজার গালমন্দ শুনেও বসে-শুয়ে নিরুদ্বিগ্ন জীবন কাটায় নদীর পাড়ে স্যালোমেশিন ঘরে। যেন ভালমতই জানা আছে, সে খুব দামী। বাজারদর তার আকাশচুম্বী। এসব কাজকর্ম না করলেও আয়েশে জীবন কাটবে। কাজের কাজ কেবল একটাই, চোর নিয়ে যাবে বলে রাতদিন স্যালোমেশিন পাহারা দেওয়া। কিন্তু জীবনে তারও একটা বড় আক্ষেপ আছে। গাঁয়ের কোন মেয়েই তাকে হিসেবের মধ্যে রাখে না। একদিকে বাবার বাড়াবাড়ি রকমের পরিশ্রম লোভ আর অহমিকা অন্যদিকে ছেলের নিরঙ্কুশ আলস্যের এমন অদ্ভুত মিশ্রণ দেখে গাঁয়ের মেয়েরা অনর্থক এসব পরিবারের বউ হবার স্বপ্ন দেখে না। আর তাই মেশিনঘরে ভটভট শব্দে কাম-কাজহীন নিরুত্তাপ জীবন কাটে সম্রাটের। মাঝেমাঝে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, কি করে স্যালোমেশিনটি নদীর পানি পাইপ দিয়ে টেনে টেনে ডাঙায় তোলে।

দুই.

হেফাজত আলীর পাকাবাড়ির অদূরেই খড়ের ছাউনি দেওয়া একটি ছিমছাম মাটির বাড়ি। এর মালিক আফজাল মিয়া। পেশায় তাকে বর্গাচাষি মনে হলেও দিন আনি দিন খাই শ্রেণিতেই তার প্রকৃত অবস্থান। দু'এক খ- জমি বর্গা চাষ করে তার বড় সংসার চলে না। নিরন্নপায় হয়েই তাঁকে অধিকাংশ সময় অন্যের জমিতে শ্রমিকের কাজ নিতে হয়। ছেলের আশায় পরপর আটটি মেয়ে। বড় দু'জনের বিয়ে হলেও ঘরে এখনও আধ-ডজন অবিবাহিত মেয়ে। মা এবং এই মেয়েরা মিলেই বর্গা জমিটুকু আবাদ করে, ফলে আফজাল মিয়া নিজের শ্রম বিক্রির ব্যাপারে দ্বিতীয়বার ভাবে না। বছরের পর বছর এভাবে চলতে চলতে থিতু হয়ে যাওয়াটাই গাঁয়ের স্বাভাবিক জীবন। এখানে দুই-একজন হেফাজত আলি বাদে বাকিরা যে শ্রেণিতে জন্মায় ঠিক সেই শ্রেণিতে থেকেই মরে যায়। পরিবর্তন বা সংশোধন শব্দগুলো এদের জীবনে বড্ড অহেতুক।

সে যাই হোক, আফজাল মিয়ার জীবনে বাড়তি কোন অশান্তি ছিল না। এমনি করেই জীবন কাটিয়ে আসছে সে, তার বাবা, তার বাবার বাবা এবং খুব সম্ভবত তারও বাবার বাবা। কিন্তু তাকে আকস্মিক এক বিপদে ফেলল দ্বিতীয় মেয়ে আরজু। যথেষ্ট রূপবতী হলেও তাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সন্তানধারণের অক্ষমতার দায় দিয়ে। তবে আরজু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সমস্যা তার নয়। আফজাল মিয়া গাঁয়ের মানী লোকজনের দারস্থ হয় মেয়ের একটা ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। তাঁরাও কেবল সান্ত্বনা বা আশ্বাস দিয়েই থেমে থাকেন না, পদক্ষেপ নেন আরজুকে পুনরায় শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর। কিন্তু বাধ সাথে আরজু নিজেই। সে কোনমতেই আর স্বামীর ঘরে ফিরতে চায় না। পরিবারের লোকজন জোরাজুরি বা কাকুতিমিনতি করলে নিরুদ্দেশ হবার হুমকি দেয়। আফজাল মিয়া জানে তার এই মেয়ে বড্ড অভিমানী আর গোঁয়ার প্রকৃতির। শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট মানুষটি মেয়েকে বোঝাতে থাকে, 'মাগো, গরীবের জেদ থাকতে নাই'। কিন্তু কোন লাভ হয় না। পাড়ার মহিলারা আরজুর ঔদ্ধত্য দেখে চোখ কপালে তোলে। কানাঘুষা করে। মুখোমুখি হলে চোখ রাঙাতে বা বিদ্রূপ করতেও ছাড়ে না। গলায় বিঁধে যাওয়া শক্ত কাঁটা নিয়ে মাঝবয়সী আফজালের দিন যেন কাটতেই চায় না। অন্যদিকে তার স্ত্রী আনিসা বেগম জায়নামাজে বসে মেয়ের জন্য জোড়হাতে প্রার্থনা করে আর স্বভাববশতই হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। অথচ আরজু সব অপমান আর অন্তর্জ্বালা উপেক্ষা করে নির্বিকারচিত্তে ঘরের কাজ করে, নদীতে পানি আনতে যায়, মা আর বোনদের সঙ্গে মাঠের কাজে সাহায্য করে, এমনকি সন্ধ্যাবাতি জ্বালানোর জন্য দূরবর্তী দোকানে কেরোসিন কিনতেও যায়। যেন সবকিছু এমনিভাবেই হবার কথা। কোথাও অস্বাভাবিক কিচ্ছুটি ঘটেনি।

তিন.

একদিন সন্ধ্যায় দোকান থেকে কেরোসিন আর মুগডাল নিয়ে ফিরছিল আরজু। পথিমধ্যে দেখা হয়ে যায় তার চেয়ে বছরকয়েক বড় সম্রাটের সঙ্গে। পাত্র হিসেবে দামী কিন্তু গোবেচারা সম্রাট তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করে, আন্তরিকভাবে খোঁজখবর নেয়, সহানুভূতি প্রকাশ করে। আরজুও তখন সাগ্রহে নিজের কথা বলে। সম্রাটের কথাও জানতে চায়। একই গ্রামে পাশাপাশি বাড়িতে বড় হয়েছে তারা। তবুও নতুন করে আবিষ্কার করে পরস্পরকে। বাড়িতে এসে ফুরফুরে মেজাজে সন্ধ্যাবাতি জ্বালায় আরজু।

এই ঘটনা একদিন, দুইদিন এমনি করে প্রতিদিনের হয়ে দাঁড়ায়। মাথায় সুগন্ধি তেল, চোখে হালকা কাজল, আর চাপা রঙের ডুরেশাড়ি গায়ে জড়িয়ে সন্ধেবেলা দোকানে কেরোসিন আনতে যাওয়াটাই আরজুর নিত্যদিনের সবচেয়ে প্রিয় কাজ এখন। এই গাঁয়ের কেবল একটা মানুষই যেন তার কষ্টটা বুঝতে পারে। সম্রাটও প্রতিদিন অপেক্ষা করে আরজুর জন্য। কখনও হাট থেকে আনা একগাছি লাল চুড়ি, কখনো বাতাসা কিংবা গুড়ের জিলিপি হাতে নিয়ে। রূপসীর তীরে ছোট্ট একটি লগ্ন এই দুই মানব-মানবীর জীবনে অদ্ভুত এক উত্তাপ নিয়ে আসে। নিজেদের তারা দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ ভাবতে থাকে।

একদিন সম্রাট অভিযোগের সুরে বলে, 'তোর সাথে এত কম সময় দেখা হয়। অস্থির লাগে। তুই খালি যাই যাই করিস'। আরজু সহজ উত্তর দেয়, 'গাঁয়ের মানুষ এমনিই হাসাহাসি করে আমাকে নিয়া। তোমার সাথে দেখলে আস্ত রাখবে?' সম্রাট কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে বলে,

'তাইলে রাইতে স্যালোমেশিন ঘরে আসিস। লোকে তখন ঘুমে থাকে।' আরজু কথার কোন উত্তর না দিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে যায়। প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সম্রাটের অস্বস্তি বাড়ে।

সেদিন রাত বাড়লে আরজু সম্রাটকে হতবাক করে দিয়ে স্যালোমেশিন ঘরে আবির্ভূত হয় নতুন রূপে। যেন কোন ভয়ডরকে সে পরোয়া করে না। তাদের জীবনে সূচনা ঘটে আরেক নতুন অধ্যায়ের। মেশিনঘরের চারপাশে শান্ত গাছগাছালির ঝিরিঝিরি বাতাস, মন্থর গতিতে রূপসীর বয়ে চলা, হেফাজত আলীর টাকা বানানোর নেশা, আফজাল মিয়ার গলায় বিঁধে যাওয়া শক্ত কাঁটা, গাঁয়ের মেয়েদের কানাঘুষা, বটগাছতলায় রসিক পাশা খেলোয়াড়দের বিড়ি ফুঁকানো, স্যালোমেশিনের মাটি কাঁপানো ভট ভট শব্দ, এই সবকিছুরই সঙ্গে ছন্দ মিলিয়েই চলতে থাকে এই দুই মানব-মানবীর উত্তাল জীবন। এমনি করে ছয় মাস কেটে গেলেও একটা কাকপক্ষীও ঠাহর করতে পারে না তাদের গোপন প্রণয়ের কথা।

চার.

আজকাল দিনগুলো কেমন বিষণ্ন কাটছে আরজুর। তবুও প্রতিদিন দোকানে যায় কেরোসিন আনতে, কিন্তু মন পড়ে থাকে অন্য কোন জগতে, অন্য কোন এক প্রসঙ্গে। সম্রাটের সঙ্গে দেখা হয়। অন্যমনস্কভাবে দুই-একটা কথাও বলে। এমনই একদিন সে সম্রাটকে জানিয়ে আসে, জরুরি কথা আছে, কিন্তু সেদিন রাতে আর ঘর থেকে বের হয় না। পরদিন সন্ধ্যায় আবার দেখা হলে কিছুটা রুক্ষ ভাবেই সম্রাট জিজ্ঞেস করে, 'কি হইসে তোর। কাইল আসতে চেয়েও আসলি না। আইজও মনটা ভার ভার'। আরজু খুব শীতল কণ্ঠে জানায় তার অন্তঃসত্ত্বা হবার খবর। সম্রাটের মাথায় যেন বাজ পড়ে। মাস ছয়েকের মধ্যে এমন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে তারা কেউই ভাবেনি। এমনকি এই প্রণয়ের গন্তব্য নিয়েও কিছু ভাবেনি। সম্রাটকে নিশ্চুপ দেখে আরজুও আর কথা বাড়ায় না। বাড়িতে এসে হারিকেন মুছে সন্ধ্যাবাতি জ্বালায়। আনমনে ভাবতে থাকে ভাগ্য তাকে নিয়ে এ কেমন খেলা খেলছে। সন্তানধারণের অক্ষমতার দায়ে তাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। সমাজ ভাবল সে অনুৎপাদনশীল অক্ষম এবং অপ্রয়োজনীয়। অথচ এখন সম্রাট দায়িত্ব স্বীকার না করলে সেই সন্তানধারণই হবে তার জন্য পৃথিবীর কঠিনতম বিপদ! তবে কি সে এই পৃথিবীতে থাকার অধিকারটুকুও হারাতে বসেছে? না, তা কি করে হয়! মনের গহিনে আশার আলো জ্বলতে থাকে, সম্রাট কিছু একটা ব্যবস্থা করবে। সে তার কষ্টগুলো বোঝে। তাকে ভালবাসে। সম্রাট দায়িত্ব নিলেই সবাই জানতে পারবে সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা আরজুর আছে। সে বন্ধ্যা নয়। সারারাত এপাশ-ওপাশ করে নানাকিছু ভাবে সে। ভাবে তার ভিতরে আরেকটি প্রাণের কথা। যে প্রাণ প্রজাপতির মত ক্রমাগত নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে সন্তানধারণের পরিতৃপ্তি আর চরম উৎকণ্ঠার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে সেই রাত নিদ্রাহীন কাটায় আরজু। ভাবে সম্রাটও নিশ্চয় ঘুমুতে পারছে না। সে কিছু একটা বুদ্ধি বের করবেই।

পরদিন যখন সম্রাটের সঙ্গে দেখা হয়, আরজু খুব নরম এবং ক্লান্তভাবে তাকায়। সম্রাট তার দিকে একবার তাকিয়েই তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। অন্যমনস্কভাবে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে পায়ের তলার নরম মাটি খুঁড়তে থাকে। একটা কাক কা কা করে কিছুক্ষণ পর দূরে কোথাও উড়ে চলে যায়। আপন গতিতে চলতে থাকে রূপসীর হাঁটুজল। কে জানে চলতে চলতে এই জল কোথায় গিয়ে মেশে? একটা বাচ্চা ছেলেকে কি একটা কারণে তার মা মারতে মারতে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যায়। ছেলেটির কান্নার সুর আজকের সন্ধ্যার আগমনকে আরও নাটকীয় এবং করুণ করে তোলে। কথা শুরু করে আরজু নিজেই, 'কিছু বলবা না?' সম্রাট বলে, 'তুই এইটা নষ্ট কর'। আরজু বলে, 'সময় নাই আর'। 'তাইলে তুই তোর স্বামীর ঘরে ফেরত যা', সম্রাট বলে। প্রথম প্রস্তাবটি তেমন অপ্রত্যাশিত মনে না হলেও দ্বিতীয়টি শোনার মানসিক প্রস্তুতি একেবারেই ছিল না আরজুর। এমন আজগুবি কথা সম্রাট কি করে বলতে পারে! আরজুর সমস্ত পৃথিবীই টলতে থাকে। সে কিছু বলার আগেই সম্রাট হড়বড় করে বলে, 'তুই তো আমার বাপকে চিনিস। আমার কোন উপায় নাই'।

এরপর খানিকক্ষণ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকলেও আর কোন কথা হয় না ওদের। আরজু বাড়ি ফিরে আসে। দূর থেকে ভেসে আসে মাগরিবের আজানের ধ্বনি, 'হাইয়াল আসসালাহ... হাইয়াল আলফালাহ...'। ডাক শুনে মুসলীরা মসজিদের দিকে এগোয়।
সেদিন আরজু আর সন্ধ্যাবাতি জ্বালায় না।

রাউফুন নাহার তরুণ কথাকার

ঘটনাপঞ্জি ❖ এপ্রিল

চিরসবুজ সুচিত্রা সেন

০৩ এপ্রিল ১৯৫৫	❖	গায়ক হরিহরণের জন্ম
০৫ এপ্রিল ২০০৭	❖	লেখিকা লীলা মজুমদারের মৃত্যু
০৬ এপ্রিল ১৯৩১	❖	সুচিত্রা সেনের জন্ম
০৯ এপ্রিল ১৮৯৪	❖	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৯ এপ্রিল ১৯৫০	❖	আইসিসিআর-এর প্রতিষ্ঠা
১০ এপ্রিল খ্রি. পূ. ৫৮৯	❖	গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ
১০ এপ্রিল ১৯০১	❖	অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম
১২ এপ্রিল খ্রি. পূ.৫৯৯	❖	জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্ম
১৪ এপ্রিল ১৮৯১	❖	বি আর আম্বেদকরের জন্ম
১৫ এপ্রিল ১৮৭৭	❖	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জন্ম
১৬ এপ্রিল ১৮৮৫	❖	বিপবী উলাসকর দত্তর জন্ম
১৮ এপ্রিল ১৮০৯	❖	হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্ম
২৩ এপ্রিল ১৯৯২	❖	সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যু
২৬ এপ্রিল ১৯২০	❖	অংকবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের মৃত্যু
২৭ এপ্রিল ১৯৬০	❖	রাজশেখর বসুর মৃত্যু

শিক্ষা-দীক্ষা

আইটেক শিক্ষাসফর ও তাজমহল দেখার অপূর্ব অভিজ্ঞতা

মো. শহীদুল ইসলাম

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কে আইটিইসি (আইটেক– ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন) এক অভূতপূর্ব সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করছে। এর ফলে দু'দেশের মানুষ একে-অপরকে কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ পাচ্ছে। এ বছর পালিত আইটেক-এর সুবর্ণজয়ন্তী অর্থাৎ ৫০ বছর পূর্ণ হল। এ উপলক্ষে ২ নভেম্বর ২০১৪ ঢাকার বঙ্গবন্ধু কনভেনশন সেন্টারে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে এক অনাড়ম্বর আয়োজন করেছিল বাংলাদেশস্থ ভারতীয় হাই কমিশন। আইটেক-এর মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে ভারত সরকারের এ সহায়তা কর্মসূচীর অধীনে বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর ৮৪৫জন পেশাজীবী এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেন, এ কর্মসূচী উন্নয়ন সহযোগিতায় ভারত সরকারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ভারতীয়দের জন্যও বাংলাদেশের কিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচী রয়েছে জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, এসব কর্মসূচী দু'দেশের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে আরও নিবিড় করছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভারতের সহায়তার ভূয়সী প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতের এ বহুমুখী উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশকে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার এবং জনগণের অবদানের কথা স্মরণ করে রাষ্ট্রপতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার পঙ্কজ সরন বলেন, ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার আইটিইসি কার্যক্রম শুরু করে। এর আওতায় ভারত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রযুক্তি

কৌশল এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা দিয়ে থাকে। তিনি অভিন্ন ইতিহাস ও সংস্কৃতির অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও অঙ্গীকার করেন।

আইটিইসি কর্মসূচীর অধীনে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম (আইটিপি-৪৬)-এ মনোনীত হই ২০১৪-র ডিসেম্বর মাসে। চট্টগ্রামস্থ ভারতের তৎকালীন সহকারী হাই কমিশনার শ্রী সোমনাথ ঘোষ এ ব্যাপারে যাবতীয় সহযোগিতা করেছিলেন। ভারত সম্পর্কে অতীতে আমার কিছু ভ্রান্ত ধারণা ছিল। যেমন, মুসলিম হিসেবে সেখানে কিরকম অভ্যর্থনা পাব। তাছাড়া, সেখানে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর শুনে মনে শংকা লেগেই থাকত। ভারতে তিন মাসের অবস্থান আমার সে ভুল ভেঙে দিয়েছে।

১ জানুয়ারি ২০১৫ ভারতের হায়দ্রাবাদের যাত্রায় প্রথমে কলকাতার উদ্দেশ্যে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করি রাত ৯.৪০ মিনিটে। আকাশপথে ঢাকা থেকে কলকাতার দূরত্ব যে খুব একটা বেশি নয় সেটা বুঝে নিতে কষ্ট হল না। মাত্র পঁচিশ মিনিটে চা খেতে খেতে কলকাতার নেতাজী সুভাষ বোস বিমান বন্দরে পৌঁছল এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটটি। আমার যাত্রাস্থল হায়দ্রাবাদগামী পরবর্তী ফ্লাইটের সময় পরদিন বেলা তিনটায়। যথারীতি কাস্টমস-ইমিগ্রেশন ইত্যাদি শেষ করে লাউঞ্জে বসে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। রাতে আর বাইরে না গিয়ে অন্যান্য যাত্রীর মত সেখানেই রাত কাটিয়ে দিলাম। সকালে বিমান বন্দরের বাইরের এলাকাটা ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। হেঁটেই বের হলাম। হাতে দু'টি লাগেজ। ট্রলি করে নিয়েই বিমান বন্দর এলাকা পার হলাম। কলকাতার রাস্তাঘাট অনেকটা আমাদের মত। এক রিক্সাচালককে জিজ্ঞাসা করলাম আশেপাশে মার্কেট কোথায়। উদ্দেশ্য, দেশে আপনজনদের কলকাতা পৌঁছনোর সংবাদটি জানানো এবং সেলুনে শেভ করা– এছাড়াও নাস্তাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সারা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বিমান বন্দরে চলে যেতে তৎপর হলাম। দুপুরের খাওয়াও একপ্রকার বাইরে সেরে নিলাম। নির্দিষ্ট সময় ফ্লাইটের দু'ঘণ্টা আগেই ভেতরে লাউঞ্জে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ফ্লাইটের জন্য। দুপুর ১.২০ মিনিটে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে দুই ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পর পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থল ভারতের হাইটেক সিটি নিজামের হায়দ্রাবাদে। বিখ্যাত টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার শহর এই হায়দ্রাবাদ। দু'দিনের জার্নি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যাম্পাসে অবস্থিত 'ঠাকুর ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে' আমার জন্য আগে থেকেই নির্ধারিত ২য় তলার ২নং স্যুটের 'বি'তে গিয়ে উঠলাম। একদিন পর আমার পাশের রুম 'এ'-তে এল আফ্রিকার বারকিনা ফাসোর মিস্টার ফেবরিস। তাঁর ভাষা ফ্রেঞ্চ। বাকি দু'একদিনের মধ্যেই ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ১২ সপ্তাহব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশ নিতে হায়দ্রাবাদ বিমান বন্দর থেকে প্রায় ২৬/২৭ কিলোমিটার দূরে টারনাকায় এসে পৌঁছলাম। এখানেই বিখ্যাত ইংলিশ এন্ড ফরেন ল্যাংগুয়েজেস ইউনিভার্সিটির অবস্থান। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শুরু হওয়া এ ট্রেনিং প্রোগ্রাম আইটিপি-৪৬-এ ৪৫টি দেশের ৯৬জন প্রতিনিধি অংশ নেন। আমাদের প্রধান কো-অর্ডিনেটর ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সুরভি ভারতী, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর আনিস কোশি এবং একাডেমিক চিফ ডক্টর বিজয়া। পাশেই বিশাল এলাকা জুড়ে হায়দ্রাবাদের অতীত শাসক নিজামের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, হায়দ্রাবাদের এই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ইংলিশ এন্ড ফরেন ল্যাংগুয়েজেস ইউনিভার্সিটির (ইএফএল-ইউ) ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ভাষা শিক্ষার জন্য অনেকেই এখানে আসে। মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, আফগানিস্তানের ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করার মত। রুটিন অনুযায়ী ইংরেজি ভাষার উপর ৭টি বিষয়ে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ক্লাশ। দুপুরে ১.০০টা থেকে দু'ঘণ্টার খাবার বিরতি। ৭টি বিষয় হচ্ছে– ভোকাবুলারি, স্পিকিং, রিডিং এন্ড ভোকাবুলারি, রাইটিং, লিসেনিং, গ্রামার ও ল্যাংগুয়েজ ল্যাব। ৬ জানুয়ারি থেকে নিয়মিত ক্লাশ শুরু হয়। শিক্ষার্থীদের সবাই বিদেশী। শুধুমাত্র শিক্ষকরা ভারতীয়। সকলেই উঁচুমানের শিক্ষক। সব মিলিয়ে মোট ৯৬জনের মধ্যে পেশাগত সাংবাদিক ছিলাম আমিসহ পাঁচজন। এঁরা হলেন, নেপালের কৃষ্ণা ধুঙ্খানা, ইথিওপিয়ার এস্টার টাডিসি ও ডেসিলিও তিলাহান, লিবিয়ার হাইতাম জেদা। তবে অংশগ্রহণকারী বিদেশীদের অধিকাংশ ছিলেন সেসব দেশের বিভিন্ন বিভাগের সরকারি কর্মকর্তা। প্রথমেই ঠিক করা হয় টিম লিডার। ভোটাভুটির মাধ্যমে আমাকে টিম লিডার নির্বাচিত করা হল। প্রথম কয়েকদিনের পরিচয়ে বিদেশীদের অনেকের নৈকট্য পেতে অসুবিধা হল না আমার। রুশ মেয়ে জুখারা চালিমোভা, ভুটানের ক্যালজং ওয়াংমো, হাইতির জোয়েন মুসকার্দি, সুদানের নুসেইবা আহমেদ, ইন্দোনেশিয়ার তওফিকুর রহমান– ভিয়েতনামের মেয়ে দান দোলান নু তো রীতিমত আমার ভক্ত হয়ে গেল। হিন্দি ভাষা জানার বাড়তি সুবিধা এবং তুলনামূলক অন্যদের চাইতে ইংরেজি ভাল বলতে পারার কারণটি হয়তো-বা এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে ভারতের অন্যতম আকর্ষণ আগ্রার তাজমহল ও রাজধানী দিল্লির ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ দেখানো হয় স্টাডি ট্যুরের অংশ হিসেবে। এই সফর বাধ্যতামূলক। হায়দ্রাবাদের এই খ্যাতনামা ভাষাশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ থেকে কয়েকজনকে পেলাম ইংরেজি ভাষায় পিএইচ ডি করছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রোকনউদ্দিন, রাজশাহী থেকে মনোয়ার ও মামুন এবং জাকারিয়াভাই পিএইচ ডি করার জন্য এখানে ভর্তি হয়েছেন। এদের মধ্যে মনোয়ার ও জাকারিয়াভাই আমি পৌঁছনোর দু'মাস পরই পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ক্যাফেটেরিয়ায় বাংলাদেশ থেকে আইটিইসি ট্রেনিং (এখানে ইন্টারনাশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম নামে পরিচিত)-এ এসেছি জানার পর মনোয়ার, রোকনউদ্দিন ও জাকারিয়াভাই আমার মোবাইল নম্বর নিয়ে আমাকে খুঁজে বের করেন। বহুদূরে দেশী মানুষ পেয়ে মনটা ভরে ওঠে। পরে আমরা একে-অপরকে নিজ নিজ কামরায় নিয়ে নিজ হাতে রান্না করে আপ্যায়ন করি।

পৌঁছনোর পর এখানকার থাকা-খাওয়া পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস থেকে নামার পর সে ধারণা দূর হল। বিদেশীদের জন্য ক্যাম্পাসে নির্দিষ্ট বহুতল হোস্টেল রয়েছে চারটি। আমার আস্তানা 'ঠাকুর ইন্টারন্যাশনার হোস্টেল' খুবই ছিমছাম। দোতলায় আমাদের স্যুটের ভেতরে দু'টি আলাদা কক্ষ যথাক্রমে 'এ' ও 'বি'। আমার কক্ষ ২/বি। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে রান্না-বান্না করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করে রাখা ছিল। রান্নার সরঞ্জাম, প্লেট, চামচ, বৈদ্যুতিক চুল্লি সব কিছুই তালিকা অনুযায়ী বুঝিয়ে দেওয়া হয়। বাথরুমে গরম পানির জন্য হিটারও ছিল। ভারত সরকারের বদান্যতার

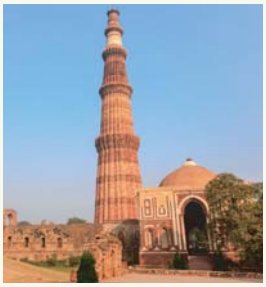

পরিচায়ক এগুলো যা প্রশংসনীয়। ২/এ-তে উঠল বারকিনা ফাসোর ফেবরিস। দু'জনের কাছেই আলাদা চাবি দেওয়া হল যাতে কোন অসুবিধায় পড়তে না হয়। দুপুরের খাবার কখনও ক্যাফেটেরিয়ায় আবার কখনও নিজ হোস্টেল রুমে সেরে নিতাম। তবে বাইরে হোটেলের খাবার বাংলাদেশের মত নয়। তবে হায়দ্রাবাদের বিরানি খুবই সুস্বাদু। এখানকার ভাষা তেলেগু। হিন্দিরও প্রচলন রয়েছে।

প্রথমদিনের একটি অভিজ্ঞতা না বললেই নয়। সন্ধ্যায় হোস্টেলের কক্ষ থেকে আযানের ধ্বনি শুনে আশ্বস্ত হলাম। পাশেই বড় মসজিদ। হায়দ্রাবাদ মুসলিম-অধ্যুষিত। এখানকার মেয়রও একজন মুসলিম। শহরের পুরনো চারমিনার এলাকায় মুসলিমদের আধিক্য চোখে পড়ে। এখানে মক্কা মসজিদ, গোলকোন্ডা ফোর্ট, চৌমহলা প্যালেস, সালার জঙ্গ মিউজিয়াম প্রভৃতি ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান দেখতে নেওয়া হল ১৮ জানুয়ারি। মোগল নিদর্শন দেখে আমরা সবাই অভিভূত হয়ে গেলাম।

এরপর এল ভারত সফরের সবচাইতে বড় আকর্ষণ বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম নিদর্শন মোগল যুগের কীর্তি তাজমহল দেখার সুযোগ। বিদেশীদেরই শুধু নয়, বহু ভারতীয়র কাছে এখনও তাজমহল দেখা সৌভাগ্যের ব্যাপার। ১৭-২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পাঁচদিনের তাজমহল দেখার ট্যুরটি ছিল সত্যি উপভোগ্য। ৯৬জন বিদেশীর মধ্যে এ সফরের জন্য আমরা তিন ভাগে বিভক্ত হলাম। আমার দলটিই ছিল বড়– ৩৯জনের নেতৃত্বে ছিলাম আমি। সঙ্গে ছিল কর্তৃপক্ষের ডেপুটি চিফ কো-অর্ডিনেটর আনিস কোশি এবং শিক্ষক ড. রবি ভামুলা এবং একজন লোকাল গাইড। হায়দ্রাবাদ থেকে স্পাইস জেট ফ্লাইটে সকাল ৬.০৫-এ উঠে দিল্লিতে পৌঁছলাম প্রায় ৮.২০ মিনিটে। সফরসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত বাসযোগে আমরা দিল্লির দর্শনীয় স্থানসমূহ মোগলকীর্তি, কুতুবমিনার, বাদশা হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ, রাষ্ট্রপতি ভবন, পার্লামেন্ট হাউস পরিদর্শন শেষে দুপুরে করলবাগ এলাকায় নির্ধারিত হোটেলে পৌঁছলাম। পরেরদিন সকালের সূচিতে ছিল বিখ্যাত জামে মসজিদ দর্শন। এরপর গেলাম মোগল দুর্গ বিখ্যাত রেডফোর্টে। এরপর ভারতের জাতীয় নেতাদের সমাধিস্থল রাজঘাট, ভারতের জাতির পিতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর স্মরণে নির্মিত 'গান্ধীস্মৃতি সেন্টার' হয়ে রাতে হোটেলে ফিরলাম। কিছুক্ষণের জন্য হোটেলের বাইরে গেলাম। কিছু কেনাকাটা এবং ভিয়েতনামের মেয়ে দান দোয়ানের আমন্ত্রণে ডিনার সারলাম বাইরের একটি হোটেলে। তৃতীয় দিন সকাল ৮.০০টায় তাজমহলের উদ্দেশে হোটেল ত্যাগ করলাম। পথিমধ্যে দুপুরে ম্যাকডোনাল্ডসে লাঞ্চ শেষে বিকেল ৩.০০টায় পৌঁছলাম ফতেপুর সিক্রিতে। এখানে কিছুক্ষণের বিরতিশেষে আবার বাসে উঠলাম শেষ গন্তব্যস্থল আগ্রার উদ্দেশে। রাত প্রায় আটটায় পৌঁছলাম তাজমহলের শহর আগ্রায়। আগে থেকে বুক করা ছিল হোটেল করনবিলাসের কক্ষসমূহ। পরদিন খুব ভোরে তাজমহল এলাকায় পৌঁছে গেলাম। সকাল সাড়ে ৬.০০টায় আমার নেতৃত্বে ৪০ জনের বিদেশী দল প্রবেশপথে জড় হল। দেখলাম বহু বিদেশী লাইনে দাঁড়িয়ে। জানলাম প্রতিদিন ৩০ থেকে ৫০ হাজার দর্শনার্থী তাজমহল দেখতে আসে। জনপ্রতি টিকেট ভারতীয় ৭২৫ রুপি। পর্যটন থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের এর চাইতে ভাল সুযোগ আর কি হতে পারে! ভাবলাম নিজের দেশের কথা। এ ধরনের অনেক প্রাচীন কীর্তি যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। অবশেষে সিকিউরিটি চেক সেরে স্বপ্নের তাজমহলে পৌঁছলাম। তখনও ভোরের কুয়াশা। আবছা আলোয় এক ঝলক দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। কাছে গিয়ে হাত দিয়ে দামী মার্বেল পাথরখচিত দেওয়াল পরখ করে দেখলাম। স্ত্রী মমতাজমহলকে উৎসর্গ করে মোগল বাদশা শাহজাহান নির্মিত বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম এই কীর্তি। চোখে না দেখলে স্বল্প পরিসরে এর সৌন্দর্যের নানা দিক বর্ণনা দেওয়া যায় না। মন ভরে দেখে নিলাম চারদিক। এরই মধ্যে যে যার যার মত করে ছবি তুললাম বিভিন্ন ভঙ্গিতে। ক্রমেই সূর্যের আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিক চিক করা আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এমন অপূর্ব দৃশ্য বহুদিন মনে থাকবে। বেলা দশটার মধ্যে দেখা শেষ করে কিছুক্ষণের জন্য হোটেলে ফিরলাম। বিরতির পর গেলাম আগ্রা ফোর্ট দেখতে। বিকেলে যমুনা নদীর অপর পারে মেহতাববাগ বাগিচা থেকে তাজমহলের সৌন্দর্য সবাইকে অভিভূত করল। পথে মেহতাববাগও ঘুরে দেখলাম। এগুলো মোগলপরিবারের স্মৃতিসৌধ। সন্ধ্যায় এরপর কিছুক্ষণ সকলে শপিং-এ বেরুলাম এবং পরে হোটেলে ফিরলাম। সফরের পঞ্চম দিন হোটেল চেক আউট করে সকালে ৯.০০টায় দিল্লির পথে যাত্রা করলাম বাসে। পথিমধ্যে সেকান্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধ দেখে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে যোগে প্রায় সাড়ে চারটায় পৌঁছে গেলাম দিল্লি বিমান বন্দরে। সেখানে থেকে রাত ৮.৩০ মিনিটে হায়দ্রাবাদের উদ্দেশে বিমানে চড়লাম। পৌঁছলাম ১০.৪০-এ। রাত প্রায় ১.০০টায় পৌঁছলাম ক্যাম্পাসে। স্টাডি ট্যুরের অংশ হিসেবে এরপর হায়দ্রাবাদের অদূরে রামোজি ফিল্ম সিটি দেখতে গেলাম।এখানে হলিউডের আদলে পাহাড়ের গায়ে গড়ে তোলা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শুটিং স্পট।

ট্রেনিং-এ চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে টেস্ট নেওয়া হয় এবং সবশেষে ২৫ মার্চ ফাইনাল পরীক্ষা। সঠিকভাবে টিম লিডারের দায়িত্ব পালন করায় একাডেমিক প্রধানের কাছ থেকে বিশেষ সার্টিফিকেট অর্জন করলাম। এটি আমার জন্যে অতীব গৌরবের বিষয়। ২৭ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে সবার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানের ঠিক আগে টীম লিডার হিসেবে বক্তৃতা ছিল বিদেশে আমার প্রথমবারের মত বক্তৃতা। ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়ে প্রচুর হাততালি কুড়ালাম। তিন মাসের এ শিক্ষা কার্যক্রম আমার স্মৃতিতে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

মো. শহীদুল ইসলাম
ভারতে প্রশিক্ষণ লাভকারী শিক্ষার্থী

নতুন
HARPIC
ALL IN 1
HARPIC POWER PLUS
ট্রাই করেছেন কি?
কঠিনতম দাগ দূর করে
৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংস করে
দূর্গন্ধ দূর করে

JUNE 21
INTERNATIONAL DAY OF YOGA

অর্জন

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত

৬৯/১৩১. আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

সাধারণ অধিবেশন,

অ-সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও রোধ-সংক্রান্ত সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের রাজনৈতিক ঘোষণার ওপর ভিত্তি করে ২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের ৬৬/২ সিদ্ধান্ত এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ও বিদেশ নীতিসংক্রান্ত ২০১৩ সালের ১১ ডিসেম্বরের ৬৮/৯৮ সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করে,

২০০৬ সালের আন্তর্জাতিক বর্ষসমূহ ঘোষণাসংক্রান্ত ১৯৯৮ সালের ১৫ ডিসেম্বরে ৫৩/১৯৯ এবং ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বরে ৬১/১৮৫ সিদ্ধান্তদ্বয় এবং আন্তর্জাতিক বর্ষ ও বার্ষিকীসংক্রান্ত ইউনেস্কোর ১৯৮০ সালের ২৫ জুলাইয়ের ১৯৮০/৬৭ সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করে,

স্বাস্থ্যপ্রদ পছন্দ ও জীবনচর্যার ধরন অনুসারে সুস্বাস্থ্য বিধানে ব্যষ্টি ও সমষ্টির গুরুত্ব গোচরে এনে এবং

বৈশ্বিক স্বাস্থ্য একটি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্য যার জন্যে সকল প্রকারের বাহুল্যবর্জিত উন্নততর ব্যষ্টিক জীবনচর্যা গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ অনুশীলন বিনিময়ের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন এরকম বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে,

স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, যোগ স্বাস্থ্য ও হিত সাধনের পবিত্র পথের সন্ধান দেয়,

এটাও স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, যোগ অনুশীলনের উপকারিতা সম্পর্কে তথ্যের ব্যাপকতর প্রচার বিশ্ব জনসংখ্যার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী,

১. ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়;

২. যথাযোগ্যভাবে এবং জাতীয় অগ্রাধিকার অনুযায়ী যোগ অনুশীলনের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে জাতিসংঘের সকল সদস্য ও পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র, অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা, এনজিও এবং ব্যক্তিবিশেষসহ নাগরিক সমাজকে আমন্ত্রণ জানায়;

৩. বর্তমান সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে উদ্ভূত সবধরনের কর্মকাণ্ডের ব্যয় স্বেচ্ছামূলক চাঁদা দিয়ে মেটানোর ওপর জোর দেয়;

৪. বর্তমান সিদ্ধান্ত সকল সদস্য ও পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘের অধীন সকল সংস্থার গোচরে আনার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করে।

৬৯তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন
১১ ডিসেম্বর ২০১৪

অনুবাদ গল্প

অমরলতা

ইস্‌মত চুগ্‌তাই

বড় মামির কফন ময়লা হতে না হতেই সারা পরিবার সুজাঅত মামুর দ্বিতীয়পক্ষের বিয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত হল। উঠতে-বসতে বউ খোঁজায় লেগে গেল। খানাপিনা শেষ করে বউ-ঝিরা যখন ছেলেদের বা মেয়েদের জামাকাপড় সেলাই করতে বসত তখন মামুর জন্যে নতুন বউয়ের খোঁজখবর করা হত।

'আরে, তার চাকরানী ফাতিমা কেমন করে থাকবে?'

'এঃ হে ঠাকরুন, ঘাস তো খাও না! চাকরানী ফাতিমার শাশুড়ি শুনতে পেলে মহা মুশকিল করে ফেলবে। জোয়ান ছেলের বিয়ে ঠিক হলে সে বউয়ের চারদিকে কাঁটা দিয়ে বসে যাবে। সেদিন আর আজকের দিন দেউড়ি থেকে পা তুলে নিয়েছে। হারামজাদীর বাপের বাড়িতে কেউ-মরে-বাঁচে তো বোধহয় কখনো আসা-যাওয়া হতে পারে।'

'আরে ভাই, সুজ্জন ভাইয়ার কি কুমারী মেয়ে জুটবে না যে এঁটো পাতা চাটবে। লোকে থালায় সাজিয়ে মেয়ে বিয়ে দেবার জন্যে তৈরি আছে। চল্লিশ বছর বয়স বলে মনেই হয় না...' অসগরী বেগম বলল।

'উই! খুদা ভাল রাখুন। দিদি পুরো দশ বছর কমিয়ে দিল। আল্লাহ রাখলে খালির মাসে (একাদশ চান্দ্রমাস। আরবে এই মাসে লোকে ঘরেই থাকে। নূরজাহান এই মাসের নাম রেখেছিলেন খালি মাস) পঞ্চাশ পূর্ণ হবে...।'

রুখসানা বেগম এমনই দেখতে যে যদি কেউ একবার তাকে দেখে তো দেখতেই থাকত। যেন প্রতিপদের কোমল লজ্জানম্র চন্দ্রলেখা– কেউ যেন তাকে মাটিতে নামিয়ে এনেছিল। চেহারা রূপ দেখে কিন্তু প্রাণ ভরে না। ওজন করলে পাঁচ ছেড়ে ছয় ফুলের দরকার হত না। রঙ এমনিই ছিল যেন উজ্জ্বল সোনা। শরীরে হাড়ের নামগন্ধ ছিল না, যেন ঠাসা ময়দার লেচির গায়ে মাখন ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। নারীত্ব এমন অদ্ভুত ছিল যেন এক ডজন মেয়ের সার নিংড়ে তার মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। যেন উত্তপ্ত অগ্নিশিখা জ্বলে উঠছিল।

'আল্লাহ্'– বেচারী ইমতিয়াজী ফুপু তো বলে ফেলে পস্তাচ্ছিল। সুজাঅত মামুর পাঁচ বোন এক দলে আর ঐ হারামজাদী আলাদা দলে, আর আল্লাহর কিরা, পাঁচ বোনের মুখে লাগাম ছিল না। তা এক এক গজের কাঁচির মত চলত। কেউ বিরোধিতা করত তো ব্যস্ পাঁচ বোনে একদম দল বেঁধে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কার সাধ্যি আছে যে কোন মুগলানি, পাঠানির মত ময়দানে লড়াই করে। বেচারী শেখানিরা, সৈয়দানিরা– তাদের কথা আর শুধিয়ো না– বড় বড় দিলওয়ালীদের সাহসিনীদের হুঁশ ঠিক করে দিত।

কিন্তু ইমতিয়াজী ফুপুও ঐ পঞ্চপা-বের উপর কৌরবের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত। তার সবচেয়ে বিপজ্জনক হাতিয়ার ছিল তার চিন্ চিন্ করে ওঠা বর্শার ডগার মত সুতীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ। বলতে শুরু করলে মনে হত যেন মেশিনগানের গুলি এক কান দিয়ে ঢুকে অপর কান দিয়ে শন্-শন্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে কারুর ঝগড়া শুরু হলে সারা মহল্লায় খবর পৌঁছে যেত যে ইমতিয়াজী ঠাকরুন কারুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর বউ-ঝিরা কোঠাঘর পেরিয়ে ছাত পেরিয়ে দঙ্গলের দিকে দৌড়ত।

পাঁচ বোন ইমতিয়াজী ফুফুকে দুরস্ত করতে গিয়ে নিজেরাই বোকা বনে যেত। তার মেজোমেয়ে গোরি খানম এখন পর্যন্ত কুমারী, সে ঘরেই ছিল। ছত্রিশটা বছর বুকের উপর শুয়ে আছে কিন্তু ভাগ্য খুলবার কোন লক্ষণ নজরে আসছিল না। কুমার পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না, বিবাহিতেরা বিপত্নীক হচ্ছিল না। আগেকার যুগে প্রত্যেক মরদ তিন-চারটেকে মেরে ফেলত, কিন্তু যেদিন থেকে হাসপাতাল ও ডাক্তারের আবির্ভাব হয়েছে বউরা যেন মরবার শপথ নিয়ে বসে আছে। তাদের দেখে মনে হয় তারা পরলোকের জন্য বিছানা বাঁধতে কৃতসংকল্প হয়েছে। বড়মামির অসুস্থতার দিনগুলিতেই ইমতিয়াজী ফুপু হিসেব করতে শুরু করেছিল, কিন্তু তার ফেরিস্তাদেরও জানা ছিল না যে কৌতুকের জন্য অনেক মেহনত করতে হবে।

সুজাঅত মামুর বয়সের হিসেব এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কমরআরা আর নূরমাসির জন্য এখনো ছেলে ছিল, এইজন্যে তারা খুব উদ্বেগের সঙ্গে বছরের হিসেবে বারবার গ-গোল করে ফেলছিল, কারণ তার বয়সের হিসেবে করা হলে মাসিরাও বয়সের প্যাঁচে পড়ে যায়। এই কারণে পাঁচ বোন বিলকুল আলাদা আলাদাভাবে হামলা শুরু করে দিয়েছিল। তারা চটপট ইমতিয়াজী ফুপুর নাতজামাইয়ের বিষয়ে কথা শুরু করল– তার হাল ফুপুকে দুঃখ দিত কারণ নাতজামাই তার নাতনীর উপর সতীন এনেছিল।

কিন্তু আমাদের ফুপু ছিল খাস মুগলানি– তার বাবা বাদশাহি ফৌজে বরকন্দাজ ছিল– সে মারখানেআলাদের মধ্যে ছিল না। সে তাদের পাঁয়তারা ব্যর্থ করে দিল আর শাহজাদি বেগমের নাতনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল– সে সরাসরি পরিবারের নাক কেটে দিচ্ছিল কেন-না সে রোজ পালকিতে চড়ে ধনকোটের স্কুলে পড়তে যেত। ঐ যুগে স্কুলে যাওয়া ততটাই সাংঘাতিক কথা ছিল যতটা আজকাল ফিল্মে নাচগান করাকে সাংঘাতিক মনে করা হয়।

সুজাঅত মামু বড় ঠিকঠাক লোক ছিলেন। একেবারে সাফ্-সুতরো চেহারা। ছিপছিপে শরীর। মাঝারি উচ্চতা। ইমতিয়াজী ফুপু সব জায়গায় বলে বেড়াত যে মামু চুলে কলপ লাগায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তার মাথায় সাদা চুল দেখেনি। এই কারণে অনুমান করা মুশকিল ছিল যে সে কবে থেকে কলপ লাগাতে শুরু করেছিল। এমনিতে দেখলে মামুকে একদম যুবক বলে মনে হয়। যথার্থই চল্লিশের ওপরে ওঠে না। যখন তার পর ঘটকের প্রস্তাবের খুব জোর বর্ষণ শুরু হল, সে বিরক্ত হয়ে তার মামলা বোনদের হাতে সৌপর্দ করে দিল। কেবল এটুকু বলে দিল যে পাত্রী যেন এত কমবয়সী না হয় যাকে দেখে তার মেয়ে বলে মনে হয়, আর যেন এত বেশি বয়সী না হয় যাকে দেখে তার মা বলে মনে হয়।

খুব খোঁজখবর করা হল। শেষ পর্যন্ত রুখসানা বেগমের নামে পাশা পড়ল।

'আরে! এটা যে ভয় পাইয়ে দেবার মত নাম!' ইমতিয়াজী ফুপু যখন কোন দোষ ধরতে পারল না তখন নামেতেই দোষ ধরল, কিন্তু পাঁচ বোনে এমনি দল বেঁধেছিল যে তার কথা কেউ শুনল না।

'ছুঁড়ির বয়স ষোলর একদিন কমও না, বেশিও না– যদি তা না হয় তবে আমাকে সকালে একশো ঘা, সন্ধ্যায় একশো ঘা জুতো মেরো, মাথার উপরে হুঁকোর জল...।'

কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। সে নিজের গোরি বেগমের ব্যবস্থা করার জন্য খামাখা ঝগড়া করতে লাগল।

রুখসানা বেগম এমনই দেখতে যে যদি কেউ একবার তাকে দেখে তো দেখতেই থাকত। যেন প্রতিপদের কোমল লজ্জানম্র চন্দ্রলেখা– কেউ যেন তাকে মাটিতে নামিয়ে এনেছিল। চেহারা রূপ দেখে কিন্তু প্রাণ ভরে না। ওজন করলে পাঁচ ছেড়ে ছয় ফুলের দরকার হত না। রঙ এমনিই ছিল যেন উজ্জ্বল সোনা। শরীরে হাড়ের নামগন্ধ ছিল না, যেন ঠাসা ময়দার লেচির গায়ে মাখন ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। নারীত্ব এমন অদ্ভুত ছিল যেন এক ডজন মেয়ের সার নিংড়ে তার মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। যেন উত্তপ্ত অগ্নিশিখা জ্বলে উঠছিল। বোধহয় ফুপুর কথানুযায়ী ষোল বছরেরই হবে, কিন্তু যৌবন ছিল উনিশ-বিশের। পাঁচ বোনে বলেছিল মামুর বয়স পঁচিশ, তাতে তার কিছুটা সংকোচ হয়েছিল কিন্তু সামলে গেছিল। বয়স কম হওয়া তো কোন বড় অপরাধ নয়।

সবচেয়ে খারাপ কথা এই যে সে ছিল এক গরিব ঘরের বোঝা। দু-তরফের খরচই মামুকে বহন করতে হয়েছিল। যখন রুখসানা মামি বিয়ের পর এলেন তখন তাকে দেখে মামুর ঘাম বেরিয়ে গিয়েছিল।

'দিদি, এ তো একেবারে বাচ্চা।' সে বিরক্ত হয়ে বলেছিল।

'আরে, খুদা ভাল করবেন। তেল দেখো তো তেলের রাগ দেখো। মরদ ষাট বছরের হলেও জোয়ান পাঁঠা। বিবি বিশ বছরের হলেও বুড়ি। দু-চারটে ছেলে হয়েছে কি সব কলাই নষ্ট হয়ে যাবে। গু-মুত পরিষ্কার করতে করতে না থাকবে সব সাজ-শৃঙ্গার, না থাকবে রঙ আর কান্তি। না থাকবে বালার মত সরু কোমর, না থাকবে বাহুর ভঙ্গিমা। যদি আর সকলের মত না দেখায় তো আমার যেন চোরের হাল হয়। আমি তো বলছি দশ বছরের মধ্যে বড় ভাবীজানের মত হয়ে যাবে।'

'আমরা আমাদের ভাইয়ের জন্য আবার সাড়ে বারো বছরের মেয়ে আনব।' নূরমাসি বলে উঠল।

'হু-শ্-শ্-শ্', মামু লজ্জা পেল।

'দ্বিতীয় বিবি বাঁচে না বলেই তৃতীয় বিবি।' শবীহ বেগম বলল।

'কী বাজে কথা বলছ?'

'হ্যাঁ মিঞা, বুড়িদের কাছে শুনেছি যে দ্বিতীয়া তো তৃতীয়ার জন্যে বলি হয়ে যায়। এই কারণে পুরনো কালে লোকে পুতুলের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে দিত, তারপর যে নববধূ আসত সে হত তৃতীয়...।'

কেউ কেউ মামিকে পরামর্শ দিয়েছিল যে মিঞাকে কাবু করার একটাই কায়দা আছে। একে খুব খানা খাওয়াও যাতে অন্য কারন্নর ঘরের গ্রাস মুখে না রোচে। ব্যস, মামি পাক-প্রণালী-পুস্তক চেয়ে এনেছিলেন, রসুনের খীর আর বাদামের গুলগুল দম্-এ মুর্গ আর মাছের কাবাব রান্না করলেন, যা খেয়ে মামু সিদ্ধান্ত করেছিলেন সে তাকে বিষ দিয়ে মারতে চায়।

বোনেরা বুঝিয়েছিল আর মামু বুঝেছিল। তারপর শীঘ্রই রুখসানা বেগমও সমঝে দিয়েছিল। দু-তিন বছরের মধ্যে ভাল খাওয়া-পরা আর প্রেমিক পতির সাহচর্যের ফলে সে জাদুবলে প্রতিপদের চাঁদ থেকে চতুর্দশীর চাঁদ হয়ে উঠেছিল। সেই ছড়িয়ে-পড়া চাঁদের আলোয় দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। ঘাটে ঘাটে চাঁদের আলো বিচ্ছুরিত হত। সুজাঅত মামুর এমন নেশা হয়েছিল যে সে একেবারে চুর হয়ে গিয়েছিল। খুদাকে ধন্যবাদ যে সে অচিরেই পেনশনভোগী হবে, না হলে ঐ দিনগুলিতে সে অবশ্যই দফতর থেকে ডুব মারত।

বোনদের সব দিয়ে-থুয়ে এক ভাই ছিল। বড়মামির বধূকালেই তার উপর থেকে মন চলে গিয়েছিল। সে কখনো ভ্রূ টানার সুযোগ পায়নি। যতদিন বেঁচে ছিল স্বামীর দর্শনের জন্য লালায়িত ছিল। খুদা তাকে সন্তান দেয়নি, না হলে ওদিকে মন যেত। মিঞা বোনদের প্রিয় ভাই ছিল– তাকে না দেখলে তাদের ভাত হজম হত না। দফতর থেকে সোজা কোন বোনের ওখানে গিয়ে পৌছত, রাতের খানা সেখানেই খেয়ে আসত। আর বড়মামি রোজ খাবার-দাবার সাজিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত পথের দিকে তাকিয়ে থাকত। দৈবাৎ যদি কোন রাতে মামু খেয়ে নিত তো তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যেত। এইসব দিনে বোনেরা এখানে হাঙ্গামা করত। শয়তান ননদেরা কখনো বউদিকেও ডেকে নিত। কিন্তু সে বেচারীর কি এখানে কি ওখানে উটকো লাগত। সবাই ডাকা ছেড়ে দিয়েছিল। সুজাঅত মামুকে কখনো কখনো জনচারেক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করতে হত বা নাচগানের মহফিল বসাতে হত। কিন্তু সেখানে বিবির দেখা পাওয়া যেত না। বোনেরাই সব বন্দোবস্ত করত। সে তাদের হাতেই টাকা দিয়ে দিত।

কেউ কেউ মামিকে পরামর্শ দিয়েছিল যে মিঞাকে কাবু করার একটাই কায়দা আছে। একে খুব খানা খাওয়াও যাতে অন্য কারুর ঘরের গ্রাস মুখে না রোচে। ব্যস, মামি পাক-প্রণালী-পুস্তক চেয়ে এনেছিলেন, রসুনের খীর আর বাদামের গুলগুল দম্-এ মুর্গ আর মাছের কাবাব রান্না করলেন, যা খেয়ে মামু সিদ্ধান্ত করেছিলেন সে তাকে বিষ দিয়ে মারতে চায়।

মামি রক্তবমি করে মরে গেল।

কিন্তু নতুন-বউয়ের জাদু, আসামাত্রই মামুর মাথায় চড়ে গেল। না কেউ আসার রইল, না কেউ যাওয়ার। না কারুর আসা ভাল। কেবল মিঞা আর বিবি। কেমন চিরসবুজের রাজ্য! মুহূর্তের মধ্যেই ছিলা-টানা তীরের মত নির্মম আর উদাসীন হয়ে যায়। দুনিয়া উজাড় হয়ে যায়। নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছে। গোরি বেগমের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে তো ভাই পর হয়ে যেত না।

'এ ভাবি! ভাইকে কতদিন আঁচলে বেঁধে রাখবে? পুরুষ জাত তো দোলনা নয় যে হরদম তাতে কনুই লাগিয়ে বসে থাকবে... ।'

লাখ লাখ বিদ্রূপ করা হলেও দুলহা-বেগম খি-খি করে হাসে আর মিঞা কাঠপেঁচার মত আওয়াজ করে– নিজের বউ, কোন পড়শীর তো নয় যে কেবল বাজার-যাওয়া লোকের মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে... ।

মামু আর সে মামু ছিল না। আজ কোথায় কাওয়ালী, কোথায় গানের মুজরো! ব্যস, বউয়ের ইশারায় সে নাচছিল। নিজেই নাচছিল।

'এ তো অল্প-দিনের জন্য হই চই। গর্ভসঞ্চার হতে না হতেই সারা নতুন-বিবিগিরি খতম। কোন না কোন দিন তো ভাইয়ের টানে ভাটা আসবে...' বোনেরা নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে রুখসানা বেগম পোয়াতি হয়েছিল তো আল্লাহ্ তোবা... না হল বমি, না হল শরীর খারাপ। মুখের কান্তি আরো বেড়ে গেল। কী শক্তি– একটুও আলস্য দেখা গেল না। সেই চাঞ্চল্য, সেই প্রেমিকার হাবভাব যা নববধূরাই দেখিয়ে থাকে...আর মামুকে তো নিমন্ত্রণ করা যায় না। তাকে তুলে নিয়ে পলকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। সে হৃদয় বার করে পায়ে-পায়ে দিয়ে দেয়। বুক থেকে নামার বদলে সে তো মাথায় চড়ে বসেছিল।

গর্ভকালের সারা সময়টাতে রুখসানা মামির সৌন্দর্যে কোন গ্রহণ লাগল না। শরীর ফুলে গেল কিন্তু কান্তি চমকাচ্ছিল। না পা ফুলে গেল, না চোখের কোলে কালি পড়ল। চলাফেরায় না কোন অসুবিধা। প্রসবের পর তাড়াতাড়ি খাড়া হয়ে গেল। কোমরের কী অধিকার যে চুলপ্রমাণ মোটা হয়ে যায়! কোমর সেই কৌমার্যের দিনের মতই ভঙ্গিমাময়। প্রসবের পর বিবিদের মাথার চুল ঝরে যায়। কিন্তু তার চুল এত ঘন হয়ে গেল মাথা ধোওয়াই মুশকিল। হাঁ, বিবির বদলে মামু কিছুটা ঝরে গেল। সে-ই যেন বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। অল্প একটু ভুঁড়ি বেরিয়ে এল। গালে লম্বা লম্বা রেখা গভীর হয়ে দেখা দিল। মাথার চুল আগের চেয়েও বেশি শাদা হয়ে গেল। আর যদি দাড়ি না থাকত তো মুখের উপর শাদা শাদা পোকার ডিম ফুটে বেরুত।

গর্ভকালের সারা সময়টাতে রুখসানা মামির সৌন্দর্যে কোন গ্রহণ লাগল না। শরীর ফুলে গেল কিন্তু কান্তি চমকাচ্ছিল। না পা ফুলে গেল, না চোখের কোলে কালি পড়ল। চলাফেরায় না কোন অসুবিধা। প্রসবের পর তাড়াতাড়ি খাড়া হয়ে গেল। কোমরের কী অধিকার যে চুলপ্রমাণ মোটা হয়ে যায়! কোমর সেই কৌমার্যের দিনের মতই ভঙ্গিমাময়। প্রসবের পর বিবিদের মাথার চুল ঝরে যায়। কিন্তু তার চুল এত ঘন হয়ে গেল মাথা ধোওয়াই মুশকিল।

দু-বছর পরে যখন মেয়ে হল তখন মামুর ভুঁড়ি আরো বেড়ে গেল। চোখের নিচে চামড়া ঝুলে গেল। নিচের পাটির দাঁতের বেদনা যখন সহ্যের বাইরে চলে গেল তখন নাচার হয়ে তা ফেলিয়ে দিতে হল। এক ইঁট সরে গেল তো সারা ইমারত ধসে পড়ল।

ঐ সময়ে মামির আক্কেল দাঁত বেরিয়েছিল।

সুজাঅত মামুর বাঁধানো দাঁতের পাটি আসল দাঁতের চেয়ে দেখতে সুন্দর ছিল। বয়সের কথা থাক, ঠা-য় তা কনকন করছে।

ইমতিয়াজী ফুপুর হিসেবে রুখসানা মামির ছাব্বিশ বছর বয়স হয়েছিল, যদিও কখনো কখনো বাচ্চাদের সঙ্গে লাফালাফি করার খেয়াল এসে গেলে সে ষোল বছরেই থমকে দাঁড়াত। কয়েক বছর ধরে তার বয়স বাড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল যে বয়স গোঁয়ার টাট্টুর মত এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছিল আর এগোবার নামও করছিল না। ননদদের হৃদয়ে করাত চলত। যখন নিজ নিজ হাত-

যে রূপ আর কচি বয়স একদিন সুজাঅত মামুকে গোলাম বানিয়েছিল, তা আজ তার ভাল লাগত না। খোঁড়া বাচ্চা যখন অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে দৌড়ে পারে না তখন চেঁচিয়ে অভিযোগ করে যে তোমরা বেইমানী করছ। মামী তাকে ধোঁকা দিয়েছিল। কখনো-কখনো তো সে ঐ বাচ্চা মেয়েদের মত হাসত আর দৌড়ত; তা দেখে মামুর হৃদয়ে খোঁচা লাগত, সে জ্বলে গিয়ে কালো হয়ে যেত।

পা শ্রান্তিতে এলে পড়ে তখন নওজোয়ানের চাঞ্চল্য ঘোড়ার চাঁটির মত কলিজাতে এসে আঘাত করে অনেকটা এমনি হয়েছিল। আর মামি সাফ-সাফ মজুত সঞ্চয় থেকেই খরচা করে যাচ্ছিল। ভদ্রতা আর ভালমানুষির দাবিমত সে স্বামীকে তার ঈশ্বর বলে মানত। ভাল-মন্দ মিলিয়ে তাকে সঙ্গ দিত এইজন্যে নয় যে তারা শ্রান্ত হয়ে বসে গেছিল আর বেগম বেদম হয়ে মুর্গির পিছনে দৌড়চ্ছিল।

'এ বউদি, খুদা তোমায় সদ্‌বুদ্ধি দিন, না আছে মাথার খবর না পায়ের খবর, হুড়োহুড়ি করে মুর্গির পিছনে দৌড়চ্ছ...।'

'তা কী করব মাসি, আমি তো বেড়াল...।'

'ঐ নাও, ঐ শোন, এই বিবি, আমি কবে থেকে তোমার মাসি হয়ে গেলাম? সুজ্জন ভাই আমার থেকে চার বছরের বড়। ইয়া আল্লা, বড় ভাই বাপের মত, তুমিও আমার বড়। খবরদার, তুমি যদি আর কখনো আমাকে মাসি বলেছ...।'

'জী, বহুৎ আচ্ছা...' বিয়ের আগে রুখসানা মামির মা ওদের পাতানো-বোন বলে ডাকত।

যে রূপ আর কচি বয়স একদিন সুজাঅত মামুকে গোলাম বানিয়েছিল, তা আজ তার ভাল লাগত না। খোঁড়া বাচ্চা যখন অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে দৌড়ে পারে না তখন চেঁচিয়ে অভিযোগ করে যে তোমরা বেইমানী করছ। মামী তাকে ধোঁকা দিয়েছিল। কখনো-কখনো তো সে ঐ বাচ্চা মেয়েদের মত হাসত আর দৌড়ত; তা দেখে মামুর হৃদয়ে খোঁচা লাগত, সে জ্বলে গিয়ে কালো হয়ে যেত।

'ছোঁড়াদের লুব্ধ করার জন্যেই কি টান-টান হয়ে হাঁটছ...' সে বিষ উগরে দিতে থাকে– 'হ্যাঁ, এখন কোন জোয়ান পাঁঠা খুঁজে নাও।'

মামি গোড়ায় হেসে উড়িয়ে দিত, তারপর লজ্জায় লাল হয়ে যেত। এতে মামু আরো খেপে যেত, আরো অনেক দোষারোপ করত।

'অমুকের সঙ্গে চোখ মারামারি করেছিলে... অমুকের সঙ্গে তোমার গোপন সম্বন্ধ আছে...।'

শুনে মামি অবাক হয়ে যেত। তার চোখে মোটা মোটা অশ্রু দেখা দিত। কাপড় ঝুলবার দড়ি থেকে দুপাট্টা টেনে সে তার শরীর ঢেকে মাথা ঝুঁকিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যেত। মামুর কলিজায় চোট লাগত। তার পায়ের তলার মাটি সরে যেত। সে তার পা চাটত। তার পায়ে মাথা খুঁড়ত, তার সামনে মাটিতে নাক ঘষত... কাঁদত...।

'আমি নিচ... আমি হারামজাদা... যত চাও তত বার আমাকে জুতোপেটা কর... মেরি জান, মেরি রুখি, মেরি মলকা... মেরি শাহজাদী...।'

তখন রুখসানা মামি তার রুপোলি হাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদত।

'মেরি জান, আমি তোমার বিমুগ্ধ প্রেমিক। ঈর্ষা আর দ্বেষে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি। তুমি যখন বাচ্চাদের কোলে নাও তখন আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে...প্রাণ চায় শালাদের গলা টিপে দিই... আমাকে মাফ কর, মেরি জান...।'

সে তক্ষুনি মাফ করে দিত। এত মাফ করে দিত যে সুজাঅত মামুর চোখের পাতা আরো ভিজে যেত আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে শ্রান্ত খচ্চরের মত হাঁফাত।

তারপর এমন দিন এসেছিল যখন সে মাফ চাইতে পারেনি। কোন কোন দিন সে রুষ্ট হয়ে যেত। বোনদের আশা বেড়ে যেত।

'ভাইয়াজান ভাবিকে বিরক্ত করে করে মারছে। আর কিছুদিন যাক, এই মেয়ে আরো কত খেলা দেখাবে!'

মামি লুকিয়ে-লুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদত। অশ্রুভরা চোখে লাল রেখা আরো মোটা হল। শুয়ে-থাকা বিবর্ণ চেহারা– যেন কোন বেইমান স্যাকরা সোনার সঙ্গে বেশি করে রুপো মিলিয়ে দিয়েছে। শুকনো-শুকনো ঠোঁট। মাথার উপরে উল্টো করে ছড়ানো বেণী। যারা দেখবে তারা নিজেদের সংবরণ করতে পারবে না। ঐ প্রাণান্তক সৌন্দর্য দেখে মামুর দু'কাঁধ আরো ঝুলে পড়ল। চোখের তলে চামড়া আরো ঝুলে গেল।

একরকম লতা আছে– অমরলতা, সবুজ সাপের মত পাতাবিহীন লতা। শিকড় হয় না। এই সবুজ লতা অন্য কোন সবুজ গাছের উপর রেখে দেওয়া হলে লতা তার রস চুষে চুষে ছড়িয়ে যেতে থাকে। এই লতা যতই ছড়িয়ে যায় ততই ঐ গাছ শুকিয়ে যেতে থাকে।

যেমন যেমন রুখসানা বেগমের যৌবনোদ্যান শোভিত হতে থাকে তেমনি মামু শুকিয়ে যেতে থাকে। বোনেরা মাথায় মাথায় মাথা লাগিয়ে ফুসুর-ফাসুর করে। ভাইয়ের দিনের পর দিন ভেঙে-পড়া স্বাস্থ্য দেখে তাদের প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছিল। ভাই একেবারে বুড়ো হয়ে গেছে। বাতের বেদনা তো ছিলই, সেইসঙ্গে সর্দি প্রাণ বার করে দিচ্ছিল। ডাক্তাররা বলেছিল, কলপ একেবারেই আপনার সহ্য হয় না। নাচার হয়ে চুলে মেহেদি লাগাতে থাকে।

বেচারী রুখসানা একটা একটা করে চুল সাদা করে ফেলার ব্যবস্থাপত্র শুধিয়ে বেড়াচ্ছিল। কেউ বলেছিল যদি সুগন্ধি তেল মাখ তো তাড়াতাড়ি সব চুল সাদা হয়ে যাবে। বেচারী মাথায় আতর ঢেলে দিয়েছিল। মামুর নাকে ঐ উন্মাদ করে দেওয়া সুগন্ধি ঢুকতে সে মামির সম্পর্কে এমন অকথ্য অভিযোগ করেছিল যে মামি বাচ্চাদের কথা যদি না ভাবত তো কুয়ায় ঝাঁপ দিত। তার মাথার চুল সাদা হবার বদলে আরো নরম আর চিকণ হয়ে শোভা পাচ্ছিল।

মামির যৌবন ক্ষয় করে দেবার জন্যে মামু য়ুনানী হাকিমদের সবরকম মাজন, পৌষ্টিক খাবার আর তেল ব্যবহার করেছিল। কিছুদিনের জন্যে তার বিদায়ী যৌবন থমকে গিয়েছিল। সৌন্দর্য ফিরে এসেছিল। দুনিয়াদারীর দাও-প্যাঁচ মামি কিছুই শেখেনি। সে ছিল আপনা-আপনি গজিয়ে ওঠা গাছ। কখনো কেউ তাকে চালাকি শেখায়নি। বয়স আঠাশ বছর হয়েছিল, কিন্তু সে ছিল আঠারো বছর বয়সের যুবতীর মত অনভিজ্ঞ আর চঞ্চল।

মোটর খুব বেশি চালালে ইঞ্জিন পুড়ে যায়। ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সুজাঅত মামু শুকিয়ে যাচ্ছিল।

মামির যৌবন ক্ষয় করে দেবার জন্যে মামু য়ুনানী হাকিমদের সবরকম মাজন, পৌষ্টিক খাবার আর তেল ব্যবহার করেছিল। কিছুদিনের জন্যে তার বিদায়ী যৌবন থমকে গিয়েছিল। সৌন্দর্য ফিরে এসেছিল। দুনিয়াদারীর দাও-প্যাঁচ মামি কিছুই শেখেনি। সে ছিল আপনা-আপনি গজিয়ে ওঠা গাছ। কখনো কেউ তাকে চালাকি শেখায়নি। বয়স আঠাশ বছর হয়েছিল, কিন্তু সে ছিল আঠারো বছর বয়সের যুবতীর মত অনভিজ্ঞ আর চঞ্চল।

একদম বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। যদি ঐ শরীর আর মস্তিষ্ক থেকে এত কিছু বেরিয়ে না যেত তা হলে বাষট্টি বছরে সবকিছুই শেষ হয়ে যেত না। এখন তাকে তার বয়সের থেকে অনেক বুড়ো দেখায়।

বোনেরা ফুঁ-ফুঁ করে কাঁদছিল। হাকিম, ডাক্তার জবাব দিয়েছিল। লোকে জোয়ান হবার লক্ষ ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিল। কিন্তু সময়ের আগে বুড়ো হবার কোন ওষুধ ছিল না– যা মামিকে খাইয়ে দেওয়া যায়। নিশ্চয়ই তার উপর কোন চিরবসন্তের জিন বা পীরমর্দ সওয়ার হয়েছিল– তার ফলে তার যৌবনে ভাটা পড়ার কোন লক্ষণই ছিল না। তাবিজ-কবচ হেরে গিয়েছিল। টোটকা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

অমরলতা ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

বটগাছ শুকিয়ে যাচ্ছিল।

ছবি হলে কেউ ছিঁড়ে দিত। মূর্তি হলে ফেলে দিয়ে চুরচুর করে দেওয়া যেত। আল্লার আপন হাতে বানানো মাটির পুতুল– সুন্দর এবং জীবন্ত। তার প্রত্যেক নিশ্বাসে যৌবনের উত্তাপ সুরভি ছড়াচ্ছিল, তাকে বশ করা যায় না। তার উঠন্ত সূর্যকে নামিয়ে দেবার একই বিধি ছিল– তাকে ভাতে মারো। ঘি, মাংস, ডিম, দুধ একেবারে বন্ধ। যখন থেকে সুজাঅত মামুর হজমশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখন থেকেই মামি কেবল বাচ্চাদের জন্য মাংস ইত্যাদি চেয়ে নিত। কখনো সখনো একটু কিছু নিজে চেখে নিত। এখন তা থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল। সকলে আশা করেছিল যে এইবার, আল্লাহ করুন, নিশ্চয়ই তার উপর বার্ধক্য নেমে আসবে।

'এ বউদি, এ কী ব্যাপার? তুমি ছুকরিদের মত বাজে সালোয়ার পরো! আরো ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ।' ননদরা বলেছিল, 'তোমার বয়সের উপযোগী ভারি-সারি পোশাক পরো...।'

মামি সেলাই-করা দুপাট্টা আর গরারা পরেছিল।

'কোন ইয়ার-বন্ধুর কাছে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছ?'– মামু বিদ্রূপ করেছিল। মামি পোশাক পরতেও ভয় পেল।

'ও ঠাকরুন, এ কী রকম যে এক-আধবার নামাজ পড়ে। পাঁচবার নামাজ পড়ার অভ্যাস করো।'

মামি পাঁচবার নামাজ পড়তে লাগল। যখন থেকে মামুর ঘুম পাতলা আর অল্প হল, তখন থেকে রাতের নামাজের সময়ও জাগতে হত।

'আমার মরে যাওয়ার নামাজ (শুকরিয়া নামাজ) পড়।' মামু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

মামির তো এমনিতেই নরম শরীর ছিল, রোজ খিচ্-খিচানিতে আরো দুর্বল হয়ে গেল। ঘি মাংস থেকে দূরে সরে থাকায় গায়ের রঙ আরো উজ্জ্বল হল। চামড়া এমনই সাফ চিকন হয়ে গেল যে একেবারে যেন আয়নার মত এদিক থেকে ওদিকে দৃষ্টি চলে যায়। মুখের উপর এক অদ্ভুত আলো দেখা গেল। আগে যারা তাকে দেখত তাদের লালা ঝরত। এখন তার পায়ে মাথা দেবার আকাঙ্ক্ষা জাগল। যখন সকালের নামাজ-এর পর কুরান পাঠ করত তখন তার মুখের উপর হজরত মরিয়মের শুচিতাদায়ী রূপ এবং ফাতিমা ও জোহরার পবিত্রতা ছড়িয়ে পড়ত। তাকে আরো কমবয়সী আর কুমারী বলে মনে হত।

মামুর কবর আরো কাছে আসতে থাকে আর সে মুখ ভরে অভিযোগ করতে ও গালি দিতে থাকে যে ভাগ্নে-ভাইপো ছাড়া সে জিন আর ফেরেশতাদের ফুসলে নিয়ে যাচ্ছে। চিল (চল্লিশ দিনের সিয়াম সাধনা) চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে জিনকে বশ করে ফেলেছে। সে জাদুর জড়িবুটি চেয়েচিন্তে খায়।

কলপের পরে এখন মেহেদি মামুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। মেহেদি লাগালেই হাঁচি হয়ে সর্দি হয়ে যায়। এতেই তার মেহেদির প্রতি ঘৃণা হয়ে যায়। রুখ্সানা মামি তার চুলে মেহেদি লাগিয়ে দিলে সবদিক সামলানো সত্ত্বেও তার হাতে মেহেদির রঙ দীপশিখার মত ঝক্মক্ করে উঠত। তার হাত দেখে সুজাঅত মামুর মনে হত যেন মেহেদি নয় মামি তার হৃদয়ের রক্তে হাত ডুবিয়ে নিয়েছে। এক সময়ে সে ঐ হাতকে চামেলির কলি বলে চুমু খেত, চোখে ছুঁইয়ে নিত; আজ তা শিক্রে বাজের মারাত্মক পাঞ্জার মত যেন তার চোখের ভিতরে ঢুকে যেতে থাকে।

যতই সে মামিকে মুঁড়ির (জড়িবুটি) মত মাটিতে ফেলে পিষত ততই মামি চন্দনের মত সুরভি ছড়াত।

বোনেরা নিজ নিজ ঘর থেকে পুষ্টিকর খাবার তৈরি করে ভাইকে খাওয়াবার জন্যে নিয়ে আসত, কারণ বলা যায় না বউদি বিষ খাইয়ে না দেয়। তারা আপন হাতে সামনে বসে খাওয়াত কিন্তু ঐ খানা খেয়ে মামুর অবস্থা আরো দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। একশিরার পুরনো রোগ তাকে খুব জোর ধরেছিল– তার যা অবশিষ্ট রক্ত ছিল তা নিংড়ে নিল। এখন ঐ অভাগার কুশ্তার (পুরুষত্বলাভের জন্য খাওয়ার পোষ্টাই দাওয়াই) আশ্রয় নেওয়া বাকি ছিল– বিখ্যাত হাকিম সাহেবের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কয়েকশো টাকা দিয়ে তৈরি করিয়ে

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইতোমধ্যে *ভারত বিচিত্রা*র অনলাইন এডিশনের সুবিধা চালু হয়ে গেছে এবং আপনারা অনলাইনে *ভারত বিচিত্রা* পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও ফেসবুকে সংযুক্ত হতে পারেন। এই মুহূর্তে পত্রিকাটির নতুন গ্রাহকদের নামঠিকানা অ ন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে। *ভারত বিচিত্রা*র পুরনো ও নতুন গ্রাহকপাঠক দের অনেকেরই টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর/ ই-মেইল আইডি আমাদের কাছে নেই। যাঁরা নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পড়তে ইচ্ছুক, এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অবিলম্বে নতুন গ্রাহক হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে নাম, পদমর্যাদা (যদি থাকে), পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি (যদি থাকে) উলেখ করে সম্পাদক বরাবর চিঠি লিখে পাঠান। সবাইকে *ভারত বিচিত্রা*র সঙ্গে সব সময় সংযুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই সংশোধিত নতুন তালিকা প্রস্তুতির এ আয়োজন।

*ভারত বিচিত্রা*র পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি, এর প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং একে আরও প্রাঞ্জল রূপ দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আপনাদের প্রিয় পত্রিকায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার কপি রেখে এবং ঠিকানা নির্ভুলভাবে লিখে পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ৬ মাসের মধ্যে মুদ্রিত না হলে বুঝতে হবে লেখা অমনোনীত হয়েছে। এ ব্যাপারে যে কোন ধরনের যোগাযোগ লেখকের অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

– সম্পাদক

অমরলতা দিনে দ্বিগুণ রাতে চারগুণ বাড়তে থাকল। বড় গাছের গুঁড়ি ফোঁপরা হয়ে গেল। শাখাগুলি ঝুলে পড়ল। পাতা ঝরে গেল... লতা আশেপাশের গাছের দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল। আত্মদাহের কেমন পরিবেশ ছিল। সুজাঅত মামুর শেষ শয্যা আঙিনায় পাতা হয়েছিল, সব সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। বোনেরা পড়ে পড়ে আছাড় খাচ্ছিল। মামু নিজের সব সম্পত্তি বোনদের নামে লিখে দিয়েছিল। রুখ্সানা মামি সকলের থেকে আলাদা হয়ে দরজায় চেপে বসেছিল। যারা বলবার তারা বলছিল যে এত সুন্দর আর বিষাদে আচ্ছন্ন বিধবা তারা জীবনে কোনদিন দেখেনি।

নেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসাপত্র ছিল রাজকীয় ঢঙের। ঐ পোষ্টিক যদি মরা মানুষে খেত তাহলে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াত, কিন্তু মামু গোদের মত ফোড়ায় ফোড়ায় ধরাশায়ী হয়ে গেল।

বেচারী মামি একশো বার ঘিকে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে তাতে গন্ধক আর কী কী সব ওষুধ বেটে ছেনে মেশাত। ঐ মলম বারবার লাগিয়ে দিত। গামলা গামলা নিমপাতা জলে সিদ্ধ করা হত আর সকাল-সন্ধ্যে পুঁজ রক্ত ধুয়ে দিত।

তারপর একদিন তো সব আঁধার হয়ে গেল। মামু খুবই দুর্বল হয়ে পড়ল। বোনেরা বসে বসে বউদির দুর্ভাগ্যে কাঁদছিল, খুদা জানেন কোথা থেকে নিজ্জী বুড়ি এসে মরেছে। গোড়ায় তো সুজাঅত মামুকে নানা-জান ভেবে তার সঙ্গে ফ্লার্ট করেছিল। কোন্ যুগে নানা-জান তার উপর খুব দয়ালু ছিলেন। হতভাগী বুড়ি ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে মরে গিয়েছে। নানা-জানের মৃত্যুর পর বিশ বছর হয়ে গেছে আর সে নিজের পিচুটিভরা চোখে পুরনো স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। অনেক দিন পার হবার পরে তাকে মামুর আসল সম্পর্ক বলে বুঝিয়েছিল, তখন মরা মামির জন্য শোক প্রকাশ করতে বসেছিল।

'এ হে, বুড়ো বয়সে কী দোয়া দিয়ে গিয়েছেন?' হঠাৎ তার নজর মামির উপর গিয়ে পড়েছিল। মামি আঙিনায় পায়রার জন্য দানা ছড়াচ্ছিল। অদ্ভুত ঢঙে সে গলা ঝুঁকিয়ে বসেছিল যেন ছবি তোলাচ্ছিল। পায়রাগুলি তার কাচের মত চক্মকে হাতের চেটোয় শুড়শুড়ি দিচ্ছিল। আর সে বিবশ হয়ে হাসছিল।

'হায়, আমি মরে গেলাম।' বুড়ি চাপাটির মত মুখ করে রুখ্সানা মামির দিকে তাকিয়ে পরের দোষ নিজের মাথায় নেওয়ার ভঙ্গিতে কানের উপর দশ আঙুল চড়-বড় করে মটকাল।

'আল্লাহ্ মঙ্গলদায়ী, বদ নজর থেকে বাঁচাও, চাঁদের টুকরো আছে, আমি সেই ছেলেবেলা থেকে বছর গুণছি। এ মিঞা–' সে কিছু সলা-পরামর্শ করবার জন্য মামুর কাছে সরে এসেছিল– 'সওদাগরদের মেজো ছেলেটা বিলাত থেকে পাস করে এসেছে... আল্লার কসম, একেবারে চাঁদ আর সূর্যের জোড়া হবে।'

কোন যুগে বুড়ি এক নম্বর কুটনী ছিল। এখন তার বাজার বন্ধ হয়ে গেছে। চুলের ঝুঁটি শাদা হয়ে গেছে। হাত-পা বেঁকেচুরে গেছে। রুটির টুকরো চেয়ে চেয়ে দিন কাটায়।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত তো কেউ বুঝতেই পারেনি যে মড়া বুড়ি কী বক্বক্ করছে। সওদাগরদের মেজো ছেলে যে বিলাত থেকে পাস দিয়ে এসেছে, সে তো সকলেরই জানা ছিল। কারুর সন্দেহ পর্যন্ত হয়নি যে বদমাশ বুড়ি রুখ্সানা মামির সঙ্গে সম্পর্ক লাগিয়ে দেবার তালে আছে।

'ইমাম হোসেনের কসম, আমি তো কঙ্কণের জোড়া নেব। কথাবার্তা শুরু করব?'

কথা যেই শুরু হল আর মৌচাক ছেড়ে মাছি বেরিয়ে এল। চার তরফ থেকে তোপ দাগতে লাগল।

'এ হেঃ! আমার মত বজ্জাতের আর কী খবর?' বুড়ি স্লিপার পরতে পরতে বাইরে ছুটে পালাল। পালাতে পালাতে মামির কাঁদো-কাঁদো চেহারার দিকে সে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। মুখের উপর তো সাফ কৌমার্য ঝরে পড়ছে।

ঐদিন সুজাঅত মামু কুরান হাতে নিয়ে সবার সামনে বলে দিয়েছিল যে এই দুই বাচ্চা তার নয়, পড়শীদের মেহেরবানীর ফল– তাদের দিকেই রুখ্সানা বেগম তাক-ঝাঁক করত।

ঐ রাতে মামু কাঁদছিল, আর্তনাদ করে পাশ ফিরছিল, আগুনের উপর শুয়েছিল। ঐ রাতে তার বড় মামির কথা খুব মনে হয়েছিল। তার মাথার চুল তো সময়ের আগেই পেকে গিয়েছিল। তার যৌবন তার বধূজীবনের অশ্রুতে বহে গিয়েছিল। ভালমানুষি আর সাধুতার প্রতিমা, সতীত্বের প্রতিমা– তার হিস্সার বার্ধক্যও যে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছিল। আর পুণ্যাত্মা বউদের মত স্বর্গে চলে গিয়েছিল। আজ যদি সে থাকত তবে এই বেদনা, এই জ্বলুনি, এই শাদা জড়িবুটির মত মেহেদি-লাগানো কেশভার, এই আঘাত দেবার সম্পর্ক, এই নিঃসঙ্গতা অন্য দিকে চলে যেত। বার্ধক্য তাকে বিচলিত করত না। দু'জনে একসঙ্গে বুড়ো হয়ে যেত, একে অপরের দুঃখ বুঝত, সাহায্য করত।

অমরলতা দিনে দ্বিগুণ রাতে চারগুণ বাড়তে থাকল। বড় গাছের গুঁড়ি ফোঁপরা হয়ে গেল। শাখাগুলি ঝুলে পড়ল। পাতা ঝরে গেল... লতা আশেপাশের গাছের দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল।

আত্মদাহের কেমন পরিবেশ ছিল। সুজাঅত মামুর শেষ শয্যা আঙিনায় পাতা হয়েছিল, সব সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। বোনেরা পড়ে পড়ে আছাড় খাচ্ছিল। মামু নিজের সব সম্পত্তি বোনদের নামে লিখে দিয়েছিল।

রুখ্সানা মামি সকলের থেকে আলাদা হয়ে দরজায় চেপে বসেছিল। যারা বলবার তারা বলছিল যে এত সুন্দর আর বিষাদে আচ্ছন্ন বিধবা তারা জীবনে কোনদিন দেখেনি।

শাদা কাপড়ে তাকে এক অদ্ভুত আকর্ষণীয় স্বপ্নের মত দেখাচ্ছিল। কেঁদে-কেঁদে চোখ নেশা-ভরা আর বোঝা-ভরা হয়েছিল। বিবর্ণ মুখ পোখরাজ-পাথরের মত চক্মক্ করে উঠছিল। যারা শোক-প্রকাশ করতে এসেছিল, তারা এ সবকিছু ভুলে কেবল তার দিকেই তাকিয়েছিল। মৃতের সৌভাগ্যে তাদের ঈর্ষা হয়েছিল।

মামির মুখের উপর আশ্রয়হীনতার ঔদাস্য আর মৃত্যুর বিষাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। ভয় আর হতভম্ব ভাবে তার মুখ আরো উদাসীন মনে হচ্ছিল।

দুই বাচ্চা তার আঁচলের সঙ্গে লেগে বসেছিল। তাকে ওদের বড় বোন বলে মনে হচ্ছিল।

সে এমনি চুপচাপ বসেছিল যেন সৃষ্টির সবচেয়ে নিপুণ শিল্পী নিজের অতুলনীয় তুলি দিয়ে কোন ছবি এঁকে সাজিয়ে রেখেছে।

অনুবাদ ড. **অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়**

লেখক পরিচিতি

ইসমত চুগতাই-এর জন্ম ১৯১৫ সালের ১৫ আগস্ট উত্তর প্রদেশের বদাউনে। প্রগতিশীল লেখক সংঘের অন্যতম সদস্য ইসমত চুগতাই ভারতীয় মুসলমান নারীদের মধ্যে প্রথম বি এ এবং বি এড্ ডিগ্রি লাভ করেন। উচ্চকোটির এই গল্পলেখক উর্দু সাহিত্যকে অনেক ভাল ভাল গল্প উপহার দিয়েছেন। তাঁর বাস্তব জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর। মানবমনের গোপন কোণে আলো ফেলতে সিদ্ধহস্ত ইসমতের শৈলীতে আছে নিপুণ কুশলতা। নারীচরিত্রের ভাষা চিত্রণে তাঁর জুড়ি নেই। নানা পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। ১৯৭৫ সালে তিনি ফিল্মফেয়ার সেরা গল্প পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮২ সালে পান সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার। ১৯৮৪ সালে লাভ করেন গালিব অ্যাওয়ার্ড। ১৯৯০ সালে রাজস্থান উর্দু একাডেমি তাঁকে ইকবাল সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৯১ সালের ২৪ অক্টোবর ৭৬ বছর বয়সে তিনি মুম্বইয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঝুলন স্মৃতি

অপূর্ব কর

শৈশবের ঝুলন খেলার স্মৃতিগুলি
দেখি এখনো কোথাও আছে
শৈশব বা কৈশোরের রেশ
যুক্তি করে একেকটা জিনিস যোগাড় করে এনে
পুতুলে পুতুলে সাজাতাম স্বপ্নের দেশ।

আজও তাই-ই করি, কত কিছু যুক্তি করে
কিনে আনি সুন্দর খাট পালঙ্ক ডিভান ফ্রিজ এসি
কত ভোজবাজি আসবাবপত্র তৈজসপত্র নানা টুকিটাকি
মনমত বাড়ি রঙ করি
হয়তো কিনে ফেলি গাড়ি, শেষে গান গাই–

ঝুলনে ঝুলত শ্যাম-রাই, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস
সে যেন কবেকার যমুনা পুলিনে গেছে ভেসে।
অনন্য কদম্বের বনে মায়াবী ঝুলন
নাই, আর নাই
নাই।

অপূর্ব কর ভারতের কবি

বৃক্ষ পদাবলি

লিলি হালদার

আকাশের জলে বিশুদ্ধ উষ্ণীষ
ফিরে গেছে সময়... সময়ের সাথে

মেঘ আকাশ... সূর্যের রঙে
এখনও কৃষ্ণচূড়া
ঘন শ্রাবণে একা, বৃষ্টি অনুরাগে।

অনিমেষ চেয়ে আছে কদম–
পাপড়িতে ঝরে পড়ে চোখের জল,
শহরের ফুটপাথ... সোনালি বরণ
নির্জন ধারাপাতে আবেগের রঙ।

সরন্ন পাতায়... মেরন্ন আলো
সবাই চলে, নিজস্ব গতি–
কদমের দৃঢ় বাহু... কাবেরী প্রেম
নামল ধারা... বৃক্ষ পদাবলি
বৃষ্টি পেখমে লিখে গেলেন।

লিলি হালদার ভারতের কবি

অন্তরালের মোহন মোহিনী

শামীমা চৌধুরী

অন্তরালের অদেখা ভুবন কতখানি উদ্ভাসিত
বাঙালি হৃদয়ে কতখানি মোহাবিষ্ট মানুষ,
প্রকৃতি, ফুল কলোল্লিত জলধারা অদেখা
অন্তরালে যাবার আগে কী জেনে গেছ?
জানো না, জানো না মোহিনী নারী,
জানো না বলেই দ্রুত ট্রেনের টিকিট কিনে
বাঙালির ভালবাসার বুক চিরে
চলে গেলে, থামলে না কোন স্টেশনে।

হে অন্তরালের মোহময়ী, পদ্মা আর
মেঘনাপারের জলেভেজা মানুষগুলো
তোমাকে বেশি খুঁজেছিল– চেয়েছিল
তোমার টলটলে গভীর দুটি চোখ
চোখ নয়, পদ্মা-মেঘনা যেন।
চলচ্চিত্র পর্দার গ-ন্মার থেকে ওরা
তোমাকে আসন দিল নিজের ঘরে
হৃৎপিণ্ডের গভীরে
তোমার অভিমানী দীর্ঘ অন্তরাল কী
সেই ঘরে ঢুকতে পেরেছিল?
হয়তো। তাই মখমলের আসন ছেড়ে
অসীম বৈরাগ্যের ভেতরে বিলীন হয়ে
দুঃখ-তাপিত মানুষের কাছে পৌঁছে গেছ।

অন্তরালের হে মোহময়ী,
তোমার জন্য পদ্মা-মেঘনার বৃষ্টিভেজা
মানুষ এক অনিন্দ্যসুন্দর বাংলাদেশকে
খুঁজে বেড়ায় তুমি তাদের ঠিকানা বলে দিও।
[প্রয়াত সুচিত্রা সেন স্মরণে]

দুঃসহ হেমন্তে

তমসুর হোসেন

দুঃসহ হেমন্তে এসে দেখে যাও আমার কষ্টগুলো
জোসনার ধবল খেয়াঘাটে নিঃসঙ্গ আবিলতায় তারা পথ খুঁজে মরে
মাঝরাতের শীতল কুয়াশায় কষ্ট পেয়ে নদীর নিশব্দ বাঁকে কাঁদে জলজ পাখিরা
পড়ে থাকে শূন্য তীরে তাদের হিমভেজা মলিন পালক।

আমার ব্যর্থতা শরতের সতেজ প্রান্তরে মেঘের ছায়ায়
তোমাকে হয়নি চেনা, হয়নি গভীর আলাপন খুব জানাশুনা
ঘোলাটে বানের জলে ভেসে ভেসে যখন এসেছি ভাদ্রের কাশের জঙ্গলে
ললাটের কোনে তখন জেগেছে দৃশ্যমান অমঙ্গল রেখা।

সারাটা জীবন যে প্রাণে জাগেনি মায়াময় সংগীতের সুর
পথে পথে ঘুরে কখনও পায়নি যে স্বস্তিকর নির্ঝঞ্ঝাট সুখের নিবাস
শীত এসে তাঁর প্রাণে পুরনো রীতিতে ঢালে প্রকৃতির ক্ষোভ
বৃক্ষের মড়কজীর্ণ প্রশাখায় কেঁপে ওঠে অঘ্রাণের হিমক্লান্ত নিথর প্রশ্বাস।

নদীজন্মের গল্প

রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

এক একটা রাত এক একটা ঘোরের চাঁদ ওঠায়। যেমনটা আজ টঙ-ঘরের মাথায়। জঙ্গলের হাতায় ধানখেত। মানুষের মতই ধান, পাকলে নুয়ে পড়ে। ডেকে আনে বৃহদাবয়ব অন্ধকারের ছায়া ছায়া। তখনও জ্বলে রাতের মাটিতে তার রূপালি শস্য জোনাক আর রাতের মাথায় অগুণান অফুরান তারা।

ছেলেটা আর মেয়েটা সকালে আলপথ ধরে জঙ্গলে ঢুকেছিল। প্রথমে সুঁড়িপথ, তারপর পথ হারিয়ে ঘন থেকে ঘনতর বিটপী অরণ্যে। অরণ্যের দিনরাত্রি ছেলেটা আর মেয়েটা দেখেছিল। তখন পিতামহ-প্রপিতামহ গাছেরা ছিল। বিকট একটা মানুষের পায়ের মতই পা ফেলে তারা দাঁড়িয়ে থাকত। এখন সবই গুল্মজাতীয়। খুব গভীরে কিছু গাছ প্রৌঢ় হচ্ছে। তাদের শরীরে দু-একটা ক্ষত চোখে পড়ে। আহা! মানুষইতো ক্ষত দেয় আর ক্ষতের গভীরে যে নিরাময় লুকিয়ে থাকে তার সাধনা করে।

ছেলেটা আর মেয়েটা প্রথমে আল, পরে সুঁড়ি তারওপরে পথ না পাওয়ার কৌতুকে মুগ্ধ হয়েছিল। এটা একটা অনিশ্চয়তা, যেমন শুনেছিল কাছে-পিঠে নদী আছে। আর কিছু জঙ্গল পেরোলেই হঠাৎ ভেসে উঠবে। তাই গভীরে অন্বিষ্ট হওয়ার আগে ছেলেটা আর মেয়েটার ভেতরেও একটা নদী পুলকিত হচ্ছিল। এসময় মেয়েটার থ্রি-কোয়ার্টার আর স্লিকারের মাঝে বাঁ-পায়ের পুরু গোছে ছড়ে যাওয়ার একটা মৃদু লাল রেখার জন্ম হল। ছেলেটা অনেকটা নিচু হয়ে, প্রায় চারপেয়ে, চেটে নিল রেখাটার লাল রঙ। তার পর মেয়েটার গালে জিভ রাখলে রেখাটার পুনর্জন্ম হল। এসময় ডাকটাও প্রথম শোনা গেল। জঙ্গলের ভেতরে জন্তু আর জন্তুর ভেতরে জান্তব কোন একটা অবিশেষ মুহূর্তে ডেকে উঠবে, এটাই নিশ্চয়তা। মেয়েটা এসময় বস্নাশ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই ডাক...

ডাকটার মধ্যে একটা শিহরন ছিল, যার স্মৃতিগত রোমন্থন পরবর্তী সময়ে বা গায়ে কাঁটা দেবে। ছেলেটা আর মেয়েটা এসময় খুব ঘন হয়ে এসেছিল। আর সেই ডাক ক্রমে বৃহদাবয়ব ছায়া অনুসরণ করে তারা নদীটাকে ভেসে উঠতে দেখেছিল।

তারা সব ছায়া ছায়ারা অরণ্যের মধ্যে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। ছেলেটা আর মেয়েটাও কাঁপছে। কাঁপছে বলেই বা বুঝি একে অপরকে ধরে আরো বেশি সংলগ্ন হচ্ছে আর একের কাঁপাটা চারিয়ে দিচ্ছে অন্যের মূলে, বাহুমূলে। ছেলেটা মেয়েটার শরীরের প্রতিটা কম্পমান অংশ অনাবৃত করে দিচ্ছিল। হতে পারে কম্পনের মৃদু রেখাগুলো ক্রমে তীব্র হচ্ছিল।

তারা সব ছায়া ছায়ারা আর নেই। দূরে দূরে পটকা ফাটানোর ডাক। এ ডাক জঙ্গলের হাতা থেকে ভেসে আসছে। তখনও ওরা নিজেদের জন্য নিজেদের ভেতর নিজেদের মত ডেকে উঠছিল।

টঙঘরের মাথায় অফুরান তারাশোভিত চাঁদ বসে আছে। অরণ্যের মত, বৃক্ষের মত, মানুষের মত চাঁদও আহত হয়ে চন্দ্রাহত হয়। টঙঘরে দুটো শরীর শুয়ে জেগে। এই প্রথম অরণ্যে বেড়াতে এসে, অরণ্যের ভেতর ছেলেটা আর মেয়েটা প্রথমে নিজেদের ও নিজেদের ভেতর অরণ্যকে আবিষ্কার করেছিল।

সেই মুগ্ধতাজনিত বিষাদ অহঙ্কৃত মেয়েটার চোখে-মুখে। আর কোন রহস্যের অপার নেই। একটা ব্যবহারই তো বহু-ব্যবহারের সূচনা। আর যে কোন বহু-ব্যবহারই ক্ষয়রোগের কারণ। তাই ছেলেটা যখন মায়ামেশানো গলায় সপ্রশ্ন হল, 'কি ভাবছিস?' তখন উত্তরের ওপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মেয়েটা চোখের জলে একটা নদী গড়িয়ে দিল। বুক ভেসে গেল তার। নাভি গড়িয়ে জঘনদেশে সে হুস করে ভেসে উঠে কোথায় মিলিয়ে গেল।

ভোরে পটকা ফাটানোর ডাকে ছেলেটা আর মেয়েটা খুব চমকে গিয়ে জেগে উঠেছিল। সেদিন জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে নদীটাকে খুঁজে পেতে তাদের সাধ-বা-সাধ্য কোনটারই প্রয়োজন হয়নি।

রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায় ভারতের কবি

স্পর্শ করতেই

নৃপেন চক্রবর্তী

তোমাকে স্পর্শ করতেই
সমস্ত অন্ধকার স্থির দাঁড়িয়ে থাকে
চৌকাঠের ওপারে।
উদ্ধত ভঙ্গি নিয়ে
রক্তস্নানে মেতেছিল যারা
তারাও দিয়েছে ফেলে
হননের শানিত কৃপাণ।

তোমাকে স্পর্শ করতেই
বন্ধ কপাটগুলো ক্রমশই খুলে যাচ্ছে,
ক্রমশই খুলে যাচ্ছে সমস্ত জটিল প্রক্রিয়া,
সবুজ সংকেত পেয়ে
নির্বিঘ্নে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে
একজন অন্ধ বাউল।

তোমাকে স্পর্শ করতেই
প্রকম্পিত সেতারে
ভেসে উঠছে কলাবতী রাগ
পাখির কলতানে নেচে উঠছে নদী
সতর্ক সীমানা ভেঙে
বেরিয়ে আসছে কাঙ্ক্ষিত মানুষ।

তোমাকে স্পর্শ করতেই
নির্জন নদীর জলে
রক্তাক্ত হাত ধুয়ে-মুছে ফেলে
একদল মানুষ
আলোর অক্ষরে লিখে দিচ্ছে
ভালবাসার গান।

নৃপেন চক্রবর্তী ভারতের কবি

ছোটগল্প

দ্বিতীয় মুখ

অনন্যা দাশ

ম্যাজিক আই দিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাকে দেখে একটু অবাকই হল প্রভা। বাইরে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকে দেখে সেলস গার্ল বলে তো মনে হচ্ছে না। তাছাড়া ফ্ল্যাটের দারোয়ান বাহাদুরকে বলা আছে উটকো লোককে ঢুকতে না দিতে। সাধারণত সে ফোন করে জিজ্ঞেস করে, 'দিদিমণি, একজন এসেছেন, এই নাম, তাকে উপরে উঠতে দেব?' কিন্তু আজকে তো তেমন কিছু করেনি। ব্যাটা নির্ঘাৎ দিবানিদ্রা দিচ্ছে বা কোথাও ডুব দিয়েছে! দরজা খোলা উচিত না উচিত নয় নিয়ে প্রভার মনে দ্বন্দ্ব চলল কয়েক সেকেন্ড। তারপর কৌতূহল চাপতে না পেরে খুলেই ফেলল দরজা।

'কাকে চাই?' গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞেস করল।

ম্যাজিক আই দিয়ে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না কিন্তু মহিলা বেশ সুন্দরী। পরনে দামি সিল্কের শাড়ি, চোখে সানগ্লাস, হাতের হ্যান্ডব্যাগও নেহাত সস্তা নয় বোঝা যাচ্ছে। বেশ রুচিসম্মতভাবে সেজেছেন। দেখে মনে হল প্রভারই বয়সী কি ওর থেকে সামান্য একটু বড় হবেন।

'প্রভা, মানে প্রভা সেন কে পাওয়া যাবে? একটু দরকার ছিল।'

'আমি প্রভা। প্রভা দাশগুপ্ত।'

'ও আচ্ছা, আমারই ভুল হয়েছে। ভিতরে আসতে পারি? আপনার সাথে কিছু কথা ছিল।'

প্রভা দরজাটা খুলে কথা বলছিল কিন্তু মহিলাকে ঘরের ভিতর ঢুকতে দেয়নি তখনও। দিনকাল যা, কিছু বলা তো যায় না। সেজেগুজে এসে যে ছিনতাই করবে না এমন তো কোন গ্যারান্টি নেই!

'কী নিয়ে কথা বলতে চান সেটা জানতে পারি?'

বাড়িতে এখন সে একা। অন্তত সীমার মা বা ছোটকুটা থাকলেও কিছুটা ভরসা পাওয়া যেত।

'চয়নকে নিয়ে কিছু কথা ছিল।'

'চয়ন?' প্রভা আকাশ থেকে পড়ল।

'হ্যাঁ, আমি ভার্জিনিয়া থেকে, মানে আমেরিকা থেকে এসেছি দু'দিন হল।'

'ও!' প্রভা আর কী বলবে বুঝতে পারল না। চয়নের সাথে ওর ডিভোর্সের ছ'বছর হয়ে গেছে। পদবীটাকেও বদলে ফেলেছে প্রভা। তবে ডিভোর্স হলেই যে সব সম্পর্ক চুকেবুকে যায় তা তো বলা যায় না। তিনমাস আগে তাই গাড়ির দুর্ঘটনায় ওর মৃত্যুর খবরটা পেয়ে খুব ভেঙে পড়েছিল প্রভা। তা ইনি আবার কী বলতে চান চয়নকে নিয়ে?

'আসুন ভিতরে আসুন,' বলতে মহিলা ঘরে ঢুকে এসে বাইরের ঘরের গুর্জরী থেকে কেনা সোফাটায় বসলেন। দামি সেন্টের গন্ধে ম ম করে উঠল ঘর।

'এক গেলাস জল পেতে পারি? এখানে আসার পর থেকে গরম আর জেট ল্যাগের চোটে ঘুম হচ্ছে না ভাল করে তাই শরীরটাও ঠিক ভাল লাগছে না।'

প্রভা জল নিয়ে আসতে আসতে ভাবল আশাকরি বমিটমি করে দেবেন না! জলের গেলাসটা নিয়ে মহিলা চোঁ চোঁ করে সব জলটুকু খেয়ে ফেললেন।

'আপনার নামটা?'

'ও হো! নামটাই তো বলা হয়নি! আমার নাম বৈশালী দেববর্মণ। চয়নকে বেশ কিছুদিন ধরে চিনি আমি। তোমার কথা... তুমিই বলছি কারণ কিছু মনে কোরো না। তুমি মনে হয় আমার থেকে ছোট আর তুমিতেই আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি! তোমার কথা অনেক বলত চয়ন। তাই এখানে এসে তোমার সাথে দেখা করার খুব ইচ্ছে ছিল। আমাকে আবার কাল সকালে ব্যাঙ্গালোর যেতে হবে, হাতে একদম সময় নেই। বেশি দিনের ছুটিও পাইনি। তোমার ফোন নম্বরটা আমার জানা ছিল না তাই ফোন করে আসতে পারিনি। আসলে আমরা কয়েকজন খুব কাছ থেকে দেখেছি চয়নকে, তাই ভাবলাম দেখা করে যাই।'

প্রভা দুম করে জিজ্ঞেস করে বসল, 'কী বলেছিল চয়ন আমার সম্পর্কে?'

'না, না, খারাপ কিছু বলেনি। ভালই সব। প্রথম প্রথম অবশ্য তুমি যাওনি বলে ওর একটু রাগ ছিল তোমার উপর,' বলে চুপ করে গেলেন মহিলা। যেন কথাগুলো শুনে প্রভা কী ভাবে রিয়্যাক্ট করে সেটা বুঝে দেখতে চাইলেন। প্রভা কিছুই বলছে না দেখে আবার শুরু করলেন, 'ওই যে বললাম না, আমাদের ক'জনের সাথে খুব ক্লোজ ছিল ও। অনেক গোপন কথাই তাই জানি।'

প্রভা একটা শুকনো হাসি হাসল, 'চয়ন বলেই আমার না যাওয়া নিয়ে রাগ করতে পারল। দায়িত্বজ্ঞান ওর কোনদিনই তেমন ছিল না। বাবামা মেয়ে দেখে সম্বন্ধ করে দিল বলে আমার সাথে বিয়েটা করল। ওর মনে হত, বউ বেশ একটা খেলনার মতন জিনিস! খেলে টেলে রেখে দেবে। তার যে একটা মন থাকতে পারে সেটা ধর্তব্যার মধ্যেই আনেনি চয়ন! এখানে আমাদের দুটো বাড়ি মিলিয়ে পাঁচ পাঁচটা অসুস্থ মানুষ! ওর বাড়িতে ওর বাবামা আর আমার বাড়িতে আমার মাবাবা আর এক বিধবা পিসি। তারা আজ আছে কাল নেই এই অবস্থা! সেই রকম পরিস্থিতিতে কী করে সব ছেঁড়ে ছুড়ে দিয়ে আমেরিকা চলে যেতাম বলতে পারেন? বিয়ের সময় ও বলেছিল কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তারপর এক বছরের মধ্যে দুম করে ভার্জিনিয়া যাবার মনস্থ করে ফেলল! তাও আমাকে কিছু না বলেই। ওই চাকরিটা অ্যাক্সেপ্ট করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেনি! ও মনে করেছিল আমাকে সারপ্রাইজ দেবে আর বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেয়েই আমি আনন্দে নেচে উঠব! আমি তখনও নতুন বউ। সব কিছুই প্রায় মেনে নিচ্ছি কিন্তু ওই একটা ব্যাপারে আমি বাধ সেধেছিলাম। চয়নেরও প্রচ-জেদ ছিল। ও ঝুঁকতে চায়নি। তাই ও চলে গেল, আমি

প্রভা একটা শুকনো হাসি হাসল, 'চয়ন বলেই আমার না যাওয়া নিয়ে রাগ করতে পারল। দায়িত্বজ্ঞান ওর কোনদিনই তেমন ছিল না। বাবা-মা মেয়ে দেখে সম্বন্ধ করে দিল বলে আমার সাথে বিয়েটা করল। ওর মনে হত, বউ বেশ একটা খেলনার মতন জিনিস! খেলে টেলে রেখে দেবে। তার যে একটা মন থাকতে পারে সেটা ধর্তব্যার মধ্যেই আনেনি চয়ন!

স্যালিকে বিয়ে করেছিল চয়ন। কিন্তু সে চয়নের সাথে তোমার চেনা চয়নের মিল নেই মনে হয়। অনেক বদলে গিয়েছিল চয়ন শেষের দিকে। হয়তো জীবনের ঘাত- প্রতিঘাতই ওকে ওইরকম করে দিয়েছিল। খুব বেশি ড্রিঙ্ক করছিল। সেটাই শেষ পর্যন্ত ওর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। অনেক বার বারণ করেছিলাম আমরা। শিলাজিৎ তো ওর জন্যে রিহ্যাবের ব্যবস্থাও করেছিল। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগেই...

ওর সাথে গেলাম না। যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ডিভোর্সের পেপার পেলাম। সই করে দিয়েছিলাম। ডিভোর্সের পরও শ্বশুরবাড়িতে যেতাম। ওর মাবাবা কেও মা বাবাই বলতাম আর ওঁরাও অশেষ স্নেহ করতেন আমাকে। শেষের দিকে ছিলাম বেশ কিছুদিন এসে। তাতেও রাগ ছিল চয়নের। ওঁদের মৃত্যুর সময় এল না পর্যন্ত!' প্রভা চট করে চোখের জল আঁচলে মুছল।

'সেটা নিয়ে ওর অনুশোচনার শেষ ছিল না। আমাকে আর শিলাজিৎকে বলেছিল। শিলাজিৎ ওর খুব কাছের বন্ধু ছিল। বলেছিল, 'এখন আর কী হবে গিয়ে? ওখানে গেলেই তো আত্মীয়স্বজন সবাই ঘেন্নার দৃষ্টি দিয়ে দেখবে! হয় ঘেন্না নয় সহানুভূতি, ও আমি নিতে পারব না!' সেই জন্যেই আর এমুখো হয়নি!'

'আপনি চা খাবেন?'

'নাহ, চা এখন না, তবে আরেকটু ঠা-া জল খাব। গলাটা আবার শুকিয়ে গেছে।'

প্রভা আবার রান্নাঘর থেকে জল আনতে চলে গেল। জল আর মিষ্টি নিয়ে ফিরে এসে দেখল বৈশালী দেওয়ালে টাঙানো পেন্টিং দুটোর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

'ছবি দুটো খুব সুন্দর। কার আঁকা?'

'আমার।'

'ও বাবা! তোমার এই গুণটার কথা তো চয়ন বলেনি কখনও!'

'ডিভোর্সের পর খুব ডিপ্রেশান হয়েছিল। তখন মন ভাল করার জন্যে আঁকার ক্লাসে ঢুকি। ভুলে থাকতে চাইছিলাম। স্যার বলেন আমার নাকি প্রকৃত ট্যালেন্ট আছে! আমি ওসব বুঝি না। আঁকতে ভাল লাগে তাই আঁকি। এই দুটো চোখে ভাল লাগে তাই বাঁধিয়েছি। তা আপনি ওখান থেকে একাই এলেন?'

'হ্যাঁ, এখানে দিদির বাড়িতে উঠেছি। রাজারহাটে।'

'আপনার ফ্যামিলি?'

'ছেলেটা বাবার কাছে থাকে। ওর বাবার সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর থেকে। আসলে আমাদের মধ্যে কোন মিল ছিল না তাই ওদেশে যাকে বলে 'কনশিয়াস আনকাপলিং' তাই করেছি আমরা। তুহিনের মা থাকেন ওর সাথে। মহিলা ভাল, তাই তাতাইকে ওর সাথেই থাকতে দিয়েছি। ভাল মানুষ হবে। আমি চাকরি করি, সারাদিন ডে কেয়ারে পড়ে থাকবে। আমার কাছে উইকেন্ডে আর ছুটিছাটাতে আসে।'

'আপনি কোথায় চাকরি করেন?'

'স্টেট গভার্নমেন্টের, কম্পিউটার জব। যাই হোক, তোমার কথা বল।'

প্রভা মাথা নিচু করে বলল, 'চয়ন তো ওখানে আবার বিয়ে করেছিল শুনেছিলাম।'

'ওহ, স্যালির কথা জান তাহলে তুমি?'

'না, মানে তেমন কিছু না। স্যালি বলে একজনকে বিয়ে করেছিল এটাই শুধু জানি। আমার এক বান্ধবীর দাদা থাকে নিউ জার্সিতে। তার কাছেই শুনেছিলাম। কোন এক পুজোতে নাকি দেখা হয়েছিল চয়নের সাথে।'

'হ্যাঁ, স্যালিকে বিয়ে করেছিল চয়ন। কিন্তু সে চয়নের সাথে তোমার চেনা চয়নের মিল নেই মনে হয়। অনেক বদলে গিয়েছিল চয়ন শেষের দিকে। হয়তো জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতই ওকে ওইরকম করে দিয়েছিল। খুব বেশি ড্রিঙ্ক করছিল। সেটাই শেষ পর্যন্ত ওর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। অনেক বার বারণ করেছিলাম আমরা। শিলাজিৎ তো ওর জন্যে রিহ্যাবের ব্যবস্থাও করেছিল। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগেই...'

'আপনি তো কিছুই খেলেন না!'

'না, সরি গো! একদম খিদে নেই। এমনিতেই আমি এখানকার গরমে কাবু। তারপর এত মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাসও চলে গেছে। এসে থেকে কম মিষ্টি খেতে হয়েছে! তোমরা কলকাতার লোকজন পারও বটে! তুমি চা করবে বলছিলে না? সেটাই বরং কর। এক কাপ চা খেয়ে আমি উঠব। রাতে আবার দিদির বাড়িতে আমার এক পুরনো বান্ধবী আসবে দেখা করতে।'

চা নিয়ে ফিরে এসে প্রভা দেখল বৈশালী টেবিল থেকে একটা বাংলা পত্রিকা তুলে নিয়ে তার পাতা ওল্টাচ্ছেন।

'জান, আমি ওখানে সব থেকে বেশি কী মিস করি?'

'কী?'

'বাংলা বই!'

'ও! তবে এখন তো শুনি নেটে অনেক কিছু পাওয়া যায়।'

'তা যায়। কিন্তু আমি বাপু পুরনো পন্থী। আমার কাগজের বই না হলে চলে না! নতুন বইয়ের এক রকম গন্ধ, পুরনো বইয়ের আর এক রকম গন্ধ, আহা! তাই এখানে এলেই কাঁড়ি কাঁড়ি বই কিনে নিয়ে যাই। যদিও এখন লাগেজের লিমিট খুব কম করে দিয়েছে আর বই অসম্ভব ভারী, তাও! এই আমি কিন্তু চায়ে চিনি খাই না। মা বাবা দুজনেরই ডায়াবেটিসের ধাত ছিল, তাই সাবধানের মার নেই!'

চায়ে এক চুমুক দিয়েই বলে উঠলেন, 'বাহ খুব ভাল চা হয়েছে! আমাদের ওখানে বাধ্য হয়ে টি ব্যাগ ব্যবহার করি কিন্তু এই রকম স্বাদ থাকে না চায়ে।'

কয়েক চুমুক খেয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে বললেন, 'ভুলে যাওয়ার আগে তোমার জিনিস তোমাকে দিয়ে দি বাপু!'

'আমার জিনিস?' প্রভা আশ্চর্য হয়ে বলল।

'হ্যাঁ', বলে ব্যাগ থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিলেন।

প্রভা ওটাকে হাতে না নিয়েই আবার জিজ্ঞেস করল,

'ডিভোর্সের পর খুব ডিপ্রেশান হয়েছিল। তখন মন ভাল করার জন্যে আঁকার ক্লাসে ঢুকি। ভুলে থাকতে চাইছিলাম। স্যার বলেন আমার নাকি প্রকৃত ট্যালেন্ট আছে! আমি ওসব বুঝি না। আঁকতে ভাল লাগে তাই আঁকি। এই দুটো চোখে ভাল লাগে তাই বাঁধিয়েছি। তা আপনি ওখান থেকে একাই এলেন?'

আমি অমন হুট করে বলতে চাইনি কথাটা! তবে মনে হল তোমার জানা উচিত। স্যালি ওয়াজ নট হ্যাপি। হি হিট হার, বিট হার, ইউ নো! লোকটার এত আস্পর্ধা ছিল যে নেশার ঘোরে বউয়ের গায়ে হাত তুলত। স্যালিকে কালো চশমা পরে কাজে যেতে হত প্রায়ই। আমি বুঝতে পারতাম কিন্তু অন্যরা খুব একটা জানত না।'
প্রভা কোন উত্তর দিল না। লেখা শেষ করে বইটা বৈশালীর দিকে এগিয়ে দিল।

'আমার জিনিস মানে? আমি ঠিক বুঝলাম না...'

'আরে বাবা ধর তো! ওগুলো স্যালি আমাকে দিয়েছে তোমাকে দেওয়ার জন্যে।'

'কিন্তু...' ভীষণ অপ্রস্তুত বোধ করছিল প্রভা।

'আরে বাবা, অত কিন্তু কিন্তু কোরো না তো! ওগুলো চয়নের জিনিস। তোমাদের বিয়ের আংটি, ওর পাঞ্জাবির বোতাম, বিয়ের ঘড়ি– যেটা এখনও ভালই চলছে। স্যালি কী করবে ওগুলো নিয়ে? তুমি যদি জিনিসগুলো না রাখতে চাও বিক্রি করে টাকাটা নিও বা দান করে দিও। যা ইচ্ছে।'

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে খুলে দেখল প্রভা। হ্যাঁ, সত্যিই চয়নের বিয়ের আংটি, পাঞ্জাবির বোতাম, ঘড়ি। বাবা কত শখ করে ওগুলো কিনেছিলেন। নিজের অজান্তেই চোখে জল এসে গেল প্রভার। চট করে চোখ মুছে দেখল বৈশালী অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে ওর দিকে দেখছেন।

'আজ তাহলে আমি আসি, কেমন? আবার দেখা হবে কিনা জানি না। তবে কলকাতা এলে চেষ্টা করব যোগাযোগ করতে।'

'এক মিনিট দাঁড়ান!' বলে প্রভা শোবার ঘরে গিয়ে একটা বই নিয়ে এল।

'আপনাকে আর কী দেব। এটা আমার প্রিয় লেখিকার লেখা একটা উপন্যাস। পড়ে দেখবেন। নতুন লেখিকা তাই আপনার পড়া হবে বলে মনে হয় না!'

'ও মা এ তো সব চেয়ে ভাল উপহার! নাহ, আমার পড়া নেই! তা তুমি লিখে দাও, তাহলে আমার মনে থাকবে।'

কলম নিয়ে ওঁর নামটা বইটার প্রথম পাতায় লিখছিল প্রভা। এমন সময় বৈশালী মৃদু স্বরে বললেন, 'স্যালি কিন্তু সুখী ছিল না!'

হাত থেকে বইটা পড়ে গেল প্রভার।

'সরি! আমি অমন হুট করে বলতে চাইনি কথাটা! তবে মনে হল তোমার জানা উচিত। স্যালি ওয়াজ নট হ্যাপি। হি হিট হার, বিট হার, ইউ নো! লোকটার এত আস্পর্ধা ছিল যে নেশার ঘোরে বউয়ের গায়ে হাত তুলত। স্যালিকে কালো চশমা পরে কাজে যেতে হত প্রায়ই। আমি বুঝতে পারতাম কিন্তু অন্যরা খুব একটা জানত না।'

প্রভা কোন উত্তর দিল না। লেখা শেষ করে বইটা বৈশালীর দিকে এগিয়ে দিল। উনি ওটাকে নিয়ে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগোলেন। প্রভা তখনও বজ্রাহতর মতন বসে রয়েছে।

বৈশালী দরজার হাতলে হাত রাখতে প্রভা বলে উঠল, 'স্যালিকে বলবেন আমার গায়েও হাত তুলেছিল চয়ন। আমেরিকা যাওয়া নিয়ে যখন ঝগড়া হচ্ছিল তখন। কথাটা আমি কাউকে বলিনি আজ পর্যন্ত। ও যদি সেদিন আমার গায়ে হাত না তুলত আমি হয়তো চলেও যেতাম ওর সাথে কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল আমি কত দুর্বল। সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে যেখানে ওই হবে আমার একমাত্র চেনা লোক, একমাত্র বন্ধু সেখানে আমি পেরে উঠব না!'

সম্মতিতে মাথা নেড়ে প্রভার কাছে এসে ওর কাঁধে একবার হাত রেখে ধীর পায়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেলেন বৈশালী।

প্রভা সোফাতেই গাটা এলিয়ে দিল। খুব ক্লান্ত লাগছে, তবে হাল্কাও লাগছে কথাটা শেষমেশ কাউকে বলতে পেরে। হয়তো একদম অচেনা একজন বলেই বলাটা সহজ হল।

কতক্ষণ ওই ভাবে বসেছিল মনে নেই প্রভার। সম্বিত ফিরল আবার বেলের শব্দ শুনে। বৈশালী ফিরে এলেন নাকি? সীমার মার তো আরো পরে আসার কথা। আস্তে আস্তে উঠে দরজাটা খুলল প্রভা। বাইরে বছর পঞ্চাশেকের এক টাকমাথা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে নমস্কার করে বললেন, 'আমার নাম সুপ্রকাশ গাঙ্গুলি। আমি আমার শ্যালিকাকে পিক আপ করতে এসেছি। কথা ছিল অফিস ফেরত ওকে এখান থেকে তুলে নেব। স্যালি কী আছে এখানে?'

'স্যালি?'

'হ্যাঁ, বৈশালী। ওকে তো স্যালি বলেই ডাকে সবাই ওদেশে সেটেল করার পর থেকে, তাই আমিও ওই নামেই ডাকি! ও কি বেরিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ', জানিয়ে মাথা নাড়ল প্রভা।

'ও, তাহলে হয়তো ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেছে। একদম তর সয় না মেয়েটার। একটা ফোন করে জানাল না পর্যন্ত যে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। মিছিমিছি আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত!' বলে ভদ্রলোক হনহন করে হেঁটে লিফটের দিকে চলে গেলেন।

হতবুদ্ধি হয়ে দরজা ধরেই দাঁড়িয়ে রইল প্রভা। বাইরে তখন সোনালি সূর্যটা বেগুনি সন্ধ্যার কোলে মুখ লুকচ্ছে ধীরে ধীরে।

অনন্যা দাশ
ভারতের ছোটগল্পকার

কতক্ষণ ওই ভাবে বসেছিল মনে নেই প্রভার। সম্বিত ফিরল আবার বেলের শব্দ শুনে। বৈশালী ফিরে এলেন নাকি? সীমার মার তো আরো পরে আসার কথা। আস্তে আস্তে উঠে দরজাটা খুলল প্রভা। বাইরে বছর পঞ্চাশেকের এক টাকমাথা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে নমস্কার করে বললেন, 'আমার নাম সুপ্রকাশ গাঙ্গুলি। আমি আমার শ্যালিকাকে পিক আপ করতে এসেছি।...'

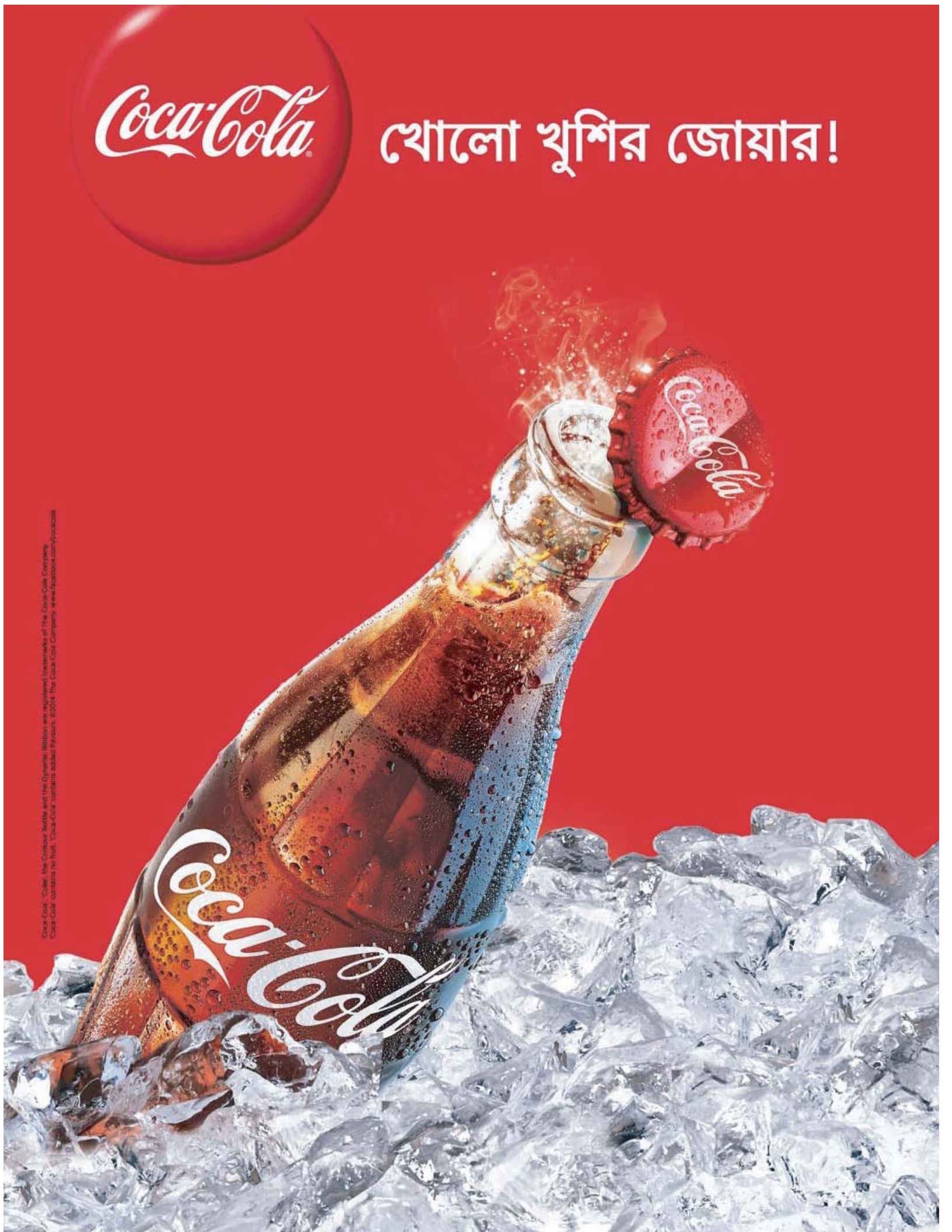
Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola, Coke, the Contour Bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
Coca-Cola contains no fruit. Coca-Cola contains added flavours. ©2014 The Coca-Cola Company www.facebook.com/cocacola

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়

সেলিনা হোসেন

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

একজনকে এমন করে দেখা বাউলার জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা। দৃশ্যটি ওকে অভিভূত করে। ও চম্পার কানের কাছে মাথা ঠেকিয়ে বলে, তুমি আমার কি নাম ঠিক করেছ চম্পা?

এখন থেকে তোমাকে আমি গোলাপ নামে ডাকব। সবাই এই নামেই ডাকবে। তুমি আমাদের কাছে একটি নতুন ছেলে হবে।

একটি মেয়েকে এত কাছে থেকে দেখা ওর জীবনে এই প্রথম। এর আগে ও এখানে ওখানে মেয়েদের দেখেছে। কিন্তু সে দেখা এমন দেখা নয়! নতুন একটি নাম পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ও আলাহরে, কি সুন্দর নাম। গোলাপ– গোলাপ–

চম্পা গলা নামিয়ে বলে, আমি যখন তোমাকে ডাকব তখন লালগোলাপ বলে ডাকব।

সত্যি। অকস্মাৎ থমকে গিয়ে দু'হাতে চোখ মুছে বলে, আমার মা নাই কেন? আমার মা থাকলে আইজকে সবচেয়ে বেশি খুশি হইত। কেন আমার মা নাই? কে আমারে জন্ম দিল তারে আমি দেখলাম না!

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বাউলা। চম্পা প্রথমে হকচকিয়ে যায়। তারপর দ্রুত ওর হাত চেপে ধরে বলে, থাম। সবাই শুনতে পাবে। তুমি কাঁদছ। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

বাউলা দু'হাতে চোখ মুছে বলে, আমি যাই। আজ থেকে আমার নতুন জীবন শুরু।

নতুন জীবন! চম্পা দু'তিন বার শব্দ দু'টো বলে। বাউলা ঘনঘন মাথা নাড়ে।

তোমার সঙ্গে আমারও নতুন জীবন শুরু হল। তাই না?

বাউলা মাথা কাত করে বলে, হ্যাঁ।

এখন তুমি কোথায় যাবে?

নদীর ধারে। ওখানে বসে গলা ছেড়ে গান গাব। আমার সব দুঃখ উজাড় করে ভাসিয়ে দেব।

চম্পা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ও 'যাই' বলে হেঁটে চলে যায়। একবারও পেছন ফিরে তাকায় না। পদ্ম এসে চম্পার পাশে দাঁড়ায়। আস্তে করে বলে, ঘরে চল। পদ্মর কাঁধে হাত রেখে চম্পা নিজেকে সামলায়। ভাবে, লালগোলাপ বোধহয় এখন থেকে অন্যভাবে দুনিয়া দেখবে। তখন ও পদ্মর দিকে তাকিয়ে বলে, মানুষের কতবার জন্ম হয় রে? পদ্ম হাসতে হাসতে বলে, বোধহয় হাজার হাজার বার। আরও বেশি হতেও পারে। আমার তো নতুন কিছু ঘটতে দেখলে ভাবি, আমার নতুন জন্ম হয়েছে। সেদিন আমি খুব আনন্দে থাকি।

চম্পা দু'চোখ প্রসারিত করে, সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি। তোমরা আমাকে পাগল ভাববে নাকি এজন্য কখনো বলি না। কেন এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছ?

আমার মনে হয়েছে লালগোলাপ আজ থেকে দুনিয়াটা অন্যভাবে দেখবে।

এরজন্য তুমি অবাক হয়েছ চম্পাবু?

হয়েছি তো। খুব অবাক হয়েছি।

বোকা, তুমি একটা বোকা। লালগোলাপের নতুন জীবন শুরু হল না আজ থেকে ওকে তো ভাবতেই হবে। চল খানিকটা পথ দৌড়ে আসি।

তুই যা, আমি পারব না।

পারবে, এস। পদ্ম হাত ধরে টান দিলে চম্পা দৌড়তে শুরু করে। দু'জনে অনেকটা পথ দৌড়ে বাড়ির সামনে এসে দেখতে পায় বয়াতী গান গাইতে গাইতে উল্টো দিকে যাচ্ছে। নিমগ্ন হয়ে গাওয়া তার গানের সুর ভেসে আসে দু'জনের কাছে– আমার পরান পাখি উড়াল দিল রে–। দু'জনে পরস্পরের হাত ধরে ভাবে সবার জীবনে একটি পরান পাখি থাকে। সেই পরান পাখি আকাশে নিয়ে যায়, পাতালেও যায়।

দু'জনে বাড়িতে ঢুকলে দেখতে পায় জয়নুল মিয়া আর শিউলি বসে আছে। ওরা কাছে এসে দাঁড়ালে শিউলি চোখ বড় করে চম্পার দিকে তাকায়। চম্পা দু'পা পিছিয়ে পদ্মর আড়ালে দাঁড়ায়। পদ্ম ওর হাত ধরে। জয়নুল মিয়া বলে, মায়েরা বস।

তোর কিছু কথা আছে রে চম্পা?

শিউলির দিকে তাকিয়ে চম্পা মাথা নাড়ে। তারপর মাথা নিচু করে বলে, আছে।

শিউলি খানিকটুকু বিব্রত হয়ে বলে, বাউলাকে পছন্দ হয়নি?

পছন্দঅপছ ন্দের কথা না। কথা অন্য।

বল কি? বাজানকে তো জানতে হবে।

বাউলা তো ছোট বয়স থেকে নিজের ঘর কি তা জানে না। এই বাড়িতে বাজান ওরে একটা ঘর দিবে। নতুন ঘর।

নতুন ঘর! বিস্মিত কণ্ঠস্বর শিউলি ও পদ্মর।

যে ঘর চিনে না তারে তো ঘর দিতে হয় বাজান। আপনে কি কন?

ঘর! জয়নুল মিয়া ঘনঘন মাথা নাড়ে। ছেলেটিকে তার খুবই পছন্দ। রান্নাঘরের পেছনে বাঁশখড় দিয়ে একটি ঘর তো উঠানোই যায়। মন্দ কি, বাড়িতে একজন মানুষ বাড়ল। দুই মেয়ে চলে গেছে। মানুষ কমেছে বাড়ির। জয়নুল মিয়া কিছু বলার আগে শিউলি জিজ্ঞেস করে, বাউলা কি ঘরের কথা কইছে?

ছি, ছি কি কন। ও কইব ক্যান? আমি কইতাছি। ও রাস্তার পোলা না! রাস্তার পোলারে ঘরে উঠাইলে ঘর দেওন লাগব।

জয়নুল মিয়া উৎফুল-কণ্ঠে বলে, ও ঠিকই কইছে মায়েরা। আমরা ওরে ঘর দিমু।

পদ্ম হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, বাঁশের বেড়া আর ছনের চাল। ভালই হইব। আমরা তো দালান উঠাইতে পারুম না। কি কন বাজান?

ঠিক। জয়নুল মিয়ার মুখ খুশিতে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। যেন ঘর তোলার আনন্দ তার যাবতীয় সুখের রাস্তা খুলে দিয়েছে। তখন ও চম্পার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলে, তুমি ওরে পথের পোলা কইবা না মাগো। ওর ঘর ওর বুকের মধ্যে আছে। গানের মধ্যে আছে।

শিউলি বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, বাজান ঠিক কইছেন। চম্পা ওর নাম রাখছে লালগোলাপ। আমরা অহন থাইকা অরে ওই নামে ডাকুম। আপনে একটা ঘর তোলার ব্যবস্থা করেন বাজান।

জয়নুল মাথা নাড়ে। দু'হাতে মাথার চুল ঠিক করতে করতে বলে, বাজারে যাই। ধান বেচব। দরদাম দেখে আসি।

চিন্তার কিছু নাই বাজান। বকুলের পাঠানো টাকা আছে ব্যাঙ্কে।

বকুল রে–। কতদিন দেখি না মাইয়াটারে।

ওতো ফোন করে বাজান। ওর কথাতো শোনেন।

এইবার জিজ্ঞেস করবে যে কবে আসবে দেশে। আর চম্পার বিয়ার সময় হাস্যু যেন বাড়িতে আসে। দু'জনরেই আসতে বলবে।

কবে তারিখ ফেলবেন বাজান?

ঘর উঠলে।

কথা শেষ করে উঠোন পেরিয়ে যায় জয়নুল মিয়া।

আকস্মাৎ তিন বোনের মনে হয় কথা ফুরিয়ে গেছে। আজ শুক্রবার। স্কুল বন্ধ। শিউলির মনে হয়, মায়ের কাছে যাই। মায়ের হাত থেকে এক লোকমা ভাত খেয়ে আসি। চম্পারও মনে হয়, মায়ের কাছে যাই। বলি, মাগো ঘরের ছেলে পাইনি, পথের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে। পদ্মরও মনে হয়, মায়ের কাছে যাই। বলি, মাগো স্কুলের সেরা দৌড়বিদ আমি। জেলার প্রতিযোগিতায় যাব। আমার ইচ্ছা আপনার সঙ্গে যাই। যাবেন তো মাগো?

শিউলির দিকে ঘুরে তাকিয়ে চম্পা বলে, বুবু বিয়ের আগে আমি কি মায়ের কাছে যাব না?

যাবি। আমরা তিনজন একসঙ্গে যাব।

কবে? চম্পার কণ্ঠে আগ্রহ ঝরে পড়ে।

ঘরটা উঠুক।

ঘর! ঘর কবে উঠবে তার কি ঠিক আছে?

ঘর না উঠলে বিয়ে হবে না। শিউলি জোর দিয়ে বলে। বাজানের কাছে টাকা না থাকলে আমি টাকা দেব। সোনামানিকটার নতুন ঘরে বাসর হবে।

পদ্ম উৎফুল-হয়ে বলে, ঘর বানানোর সময় আমি কাজ করব। খড় এনে ধরিয়ে দেব ঘরামীর হাতে। দড়ি এগিয়ে দেব। পানি দেব।

হয়েছে, থাম পদ্ম। শিউলি ধমক দেয়। কেবল কথা। এত কথা দিয়ে দিন চলে না। কথা শেষ করে বারান্দায় নেমে যায় শিউলি। ছোট দুই বোন নিজেদের দৃষ্টি প্রসারিত করে। আকাশের দিকে তাকায়। রান্নাঘরের চালে বসে কবুতরগুলো ডেকে যাচ্ছে। দুই বোন দেখতে পায়

শিউলি রান্নাঘরের পেছনের খোলা জায়গাটি পা ফেলে ফেলে মাপছে। পদ্ম উৎফুল-হয়ে বলে, বুবু ঘরের জমি খোঁজে। চল আমরাও যাই।

দু'বোন এক দৌড়ে শিউলির কাছে যায়। চল, আমরাও জমি মাপব। একটা দড়ি নিয়ে আসি বুবু?

না, দড়ি লাগবে না। আমি পা ফেলে মাপব। কয়বার পা ফেললাম তোরা তা গুণবি।

কেন গুণব?

তাহলে জায়গাটা কত বড় তার হিসাব আমরা করতে পারব। আর বাজান যদি বেশি জমি দিতে রাজি হয় তাহলে ঘরটাকে আমরা চম্পার ফুটবল খেলার মাঠ বানাব।

পদ্ম উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভরিয়ে দেয় চারদিক। গানের সুরে টেনে টেনে বলে, চম্পাবুর বিয়ে হবে/ ফুটবল খেলা হবে/ লাল গোলাপের সুগন্ধিতে/ ভরবে বাসর ঘর। একসময় গান থামিয়ে বলে, আমি খেলার রেফারি হব। আবার হাহা হাসি তে ভরে যায় প্রাঙ্গণ। শিউলির মনে হয় ঘর বানানোর জন্য জমি মাপার সময় ভরে উঠেছে হাসির তুফানে। চম্পা মুখ নিচু করে ভাবে, ওকে দিয়ে বাড়িতে একজন মানুষ বাড়ল। ওর কেউ না থাকলে কি হবে, ওর নিজের যাদুকরী শক্তি আছে। এই বাড়িকে ভরিয়ে তোলার শক্তি। ও এই বাড়িতে আনন্দে থাকবে তো? নাকি বলবে, চম্পা চল আমরা অন্য কোথাও যাই।

এসব প্রশ্নের উত্তর চম্পার নিজের কাছে নাই। ও শুনতে পায় পদ্মর হাসির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবুতরের বকমবকম ধ্বনি। দুইয়ে মিলে বয়ে যায় আনন্দের আবেশ। ও আবেগে চোখ বোজে।

মাস দুয়েকের মধ্যে ঘর ওঠে। একটি চৌকি কেনা হয়। চৌকির ওপর মাদুর দিয়ে তার ওপরে নকশিকাঁথা বিছিয়ে দেয় শিউলি। 'যাও পাখি বল তারে' নকশা দিয়ে তৈরি হয় বালিশের কভার। নতুন গামছা ঝোলে দড়িতে। বকুল জানিয়েছে, ও কাউকে পেলে কম্বল পাঠাবে বাউলা আর চম্পার জন্য। জানিয়েছে, দুটি বোনের বিয়েতে থাকতে পারল না বলে ওর মনে খুব দুঃখ। হাস্নুহেনা বিয়েতে আসবে বলে জানিয়েছে। এই বাড়িতে ওদের বাসর হয়নি। পাঁচ বোনের মধ্যে চম্পাই প্রথম যার বাসর এই বাড়িতে হবে। হয়তো একটি সন্তানও জন্ম নিতে পারে এই বাড়িতে। সব চিন্তা শিউলির বুকের মধ্যে হু-হু করে বয়ে যায়। আনন্দ হয়, দুঃখও। ঘর বড় করতে বাধা দিয়েছিল বাউলা। বলেছিল, জমি নষ্ট করে ঘর বড় করতে হবে কেন? ঘরের পাশের খালি জমিতে আবাদ

হবে। লাউকুম ড়োপুঁইশাক – তারপর হাসতে হাসতে বলেছিল, যার ঘরই নাই, তার আবার বড় ঘর।

শিউলি আঁতকে উঠে বলেছিল, তুমি আর এমন কথা বলবে না সোনাভাই। এখন তোমার ঘর হয়েছে। একদম নিজের ঘর। কেউ এখানে হাত দিবে না।

জমিন?

বাবাকে বলব তোমার নামে লিখে দিতে।

আমার নামে না। আমার এইসব লাগে না।

তোমার ঘর, তোমার জমিন সোনাভাই।

সোনাবুবু এই কথা আর বলবেন না। আমার শুনতে ভাল লাগছে না। বাউলা ভুরু কুঁচকায়। মাথার ওপর প্রখর রোদ। তারপরও ওর মনে হয় চম্পার মুখ ভেসে আছে আকাশের কিনারে। ওর জীবনসঙ্গী হবে, ওকে নিয়েইতো ঘর। সেই ঘরের চাল ছাওয়ার সময় ঘরামির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল ও। বলেছিল, আমাকে ঘরছাওয়া শেখান চাচা। ক্যান তুমি ঘরামি হইবা? হইতে পারি। ঘর ছাইতে ছাইতে গান করুম। ঘরে বাস করতে হইলে গানও লাগে। সেদিন ও যখন বলেছিল, নিজের ঘর নিজে বানাই, তখন খিলখিল করে হেসেছিল চম্পা। বাউলার মনে হয়েছিল, বড় বেশি প্রাণজুড়া নো হাসি। এজন্য মানুষের ঘরের দরকার হয়।

বিয়ের দিন ঠিক হলে চম্পা বলে, বিয়ের দিন আমার মাকে এই বাড়িতে থাকতে হবে।

জয়নুল মিয়া মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে বলে, তোমার মা কি আসবে?

গোলাপ গিয়ে মায়ের কাছে দাঁড়ালে আসবে। ও বলবে, আমার মা নাই। আপনি আমার মা। মাকে ছাড়া ছেলের বিয়ে হবে না।

পদ্ম হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠে বলে, ঠিক। এবার মাকে এনেই ছাড়া হবে। কি বল বুবু?

শিউলিরও মনে হয়, বাউলা গিয়ে দাঁড়ালে ওর মা না এসে পারবে না। বাউলার এক ভালবাসামাখা নো চেহারা আছে। আছে সুন্দর কথা। সব মিলিয়ে ওই পারবে মাকে রাজি করাতে।

জয়নুল শিউলির দিকে তাকায়, তুই কি বলিস মা?

বাউলা পারবে মাকে আনতে।

সত্যিতো? জয়নুল মিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকায়।

চম্পা হাসতে হাসতে বলে, ও বলেছে মাকে আনার জন্য পালকি নিয়ে যাবে। মা যদি আসতে রাজী না হয় তবে কোলে করে মাকে পালকিতে উঠাবে। তারপর আমরা সবাই মিলে পালকি ঘাড়ে তুলে নেব। মা তখন ঠিকই আসবে।

চম্পার কথা শুনে জয়নুল মিয়ার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। সত্যি কি রাশিদুনের সঙ্গে দেখা হবে আবার এই বাড়িতে? পারবে কি ছেলেটি এমন অঘটন ঘটাতে?

বাজান।

শিউলি মৃদুস্বরে ডাকে। জয়নুল মিয়া ওর দিকে তাকায় না। বড় বেশি আনমনা হয়ে যায়। বিয়ের আগে রাশিদুনকে নিয়ে থাকবে বলে সে একটি ছোট ঘর উঠাতে চেয়েছিল। মা দেয়নি। বলেছিল, তুই বাড়ির কর্তা হবি। তোর আবার আলাদা ঘরের দরকার কি? মায়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি জয়নুল মিয়া। বলতে পারেনি, ঘরতো শুধু বাস করার জন্য না। ভালবাসার মানুষকে ভালবাসার ঘর দেওয়ার জন্যইতো এমন চিন্তা ছিল। কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। বড় ঘর আর ছোট ঘর হোক কোন ঘরেই থাকা হল না রাশিদুনের।

বাজান! শিউলি আবার ডাকে।

জয়নুল ওর দিকে না তাকিয়ে বলে, কও মা, কি কইবা।

আমরা কালকে আম্মার কাছে যাব। কাল আমার স্কুল বন্ধ আছে।

জয়নুল কিছুই বলে না। বোকার মত তাকিয়ে থাকে। এই মুহূর্তে কারও কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার মত সামর্থ্য ওর নেই। নিজের ভেতরের অন্তর্গত ক্ষরণে ভেসে যাচ্ছে বুকের পাঠাতন। প্রশ্নের উত্তর দেবে কি, নিজেকে সুস্থির রাখতেই খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। চোখের কোণে পানি জমে। সেদিকে তাকিয়ে শিউলি চুপসে যায়। ভাবে, বাবার কষ্ট বাড়িয়ে লাভ নেই। জীবনের এতটা সময় ধরে বাবাতো নিজের ভুলের

> গোলাপ! আয় বাবা। রাশিদুন হাত বাড়ায়। বাউলা এসে সালাম করে। পা জড়িয়ে ধরলে রাশিদুন বসে পড়ে, বলে, ছাড় ছাড়। পাগল ছেলে। বাউলা মাথা নিচু করে বলতে থাকে, আমার মা কে আমি তা জানি না। আমি যার সঙ্গে সংসার করব আপনি তার মা। সেজন্য আপনি আমার মা। আজ থেকে আমি একজন মা পেলাম। আর কখনও মা খুঁজব না। আপনি আমার মা খোঁজার শেষ মানুষ।

খেসারত দিয়েছে। তাকে আর নতুন করে কাঁদানো ঠিক হবে না।

পরদিন বাউলাকে সঙ্গে নিয়ে তিন বোন মামার বাড়ির পথে রওনা করে। মায়ের জন্য একটি শাড়ি নিয়েছে। সঙ্গে পাটালিগুড়ের সন্দেশ। চম্পার বিয়ের খবর লোক মারফত চিঠি পাঠিয়ে মাকে জানিয়েছে শিউলি। লোক এসে বলেছে, খালার জ্বর। তিন দিন ধরে বিছানায়।

আমরা গেলে ভাল হয়ে যাবে।

চম্পাবুর বিয়ের তারিখ হয়েছে জানলে মা আর বিছানায় শুয়ে থাকতেই পারবে না। ফড়িংয়ের মত উড়বে।

তোদের মনে দেখছি অনেক আনন্দ। অনেক দিন মায়ের কাছে যাইনি। ফড়িংয়ের মত উড়ে যেতে মন চায় না।

চম্পাপ দ্বর এমন কথা শুনে উৎফুল-হয় বাউলাও। ছোটবেলা থেকে কতজনকেই তো মা ডেকেছে। অনেকের কথা এখন আর মনে নেই। দু'চারজন স্মৃতিতে আছে। আর কত মা খুঁজবে ও? বাউলার চোখে পানি আসে। কাউকে চোখের পানি দেখাবে না বলে ওদের কাছ থেকে দূরে সরে যায় ও। চোখ মুছে কাছে এসে শিউলিকে বলে, সোনাবুবু মা দেখতে কেমন?

শিউলি হাসতে হাসতে বলে, পরির মত।

তাহলে মাকে আমি পরিমা ডাকব। আমার দেখাদেখি চম্পা কিন্তু ডাকবে না। পরিমা আমার একার হ বে।

তোমার একার হবে? চম্পা ভুরু কুঁচকায়।

বাউলা হাহা ক রে হাসে। হাসতে হাসতে সামনে এগিয়ে যায়। দু'পাশে বিস্তৃত ধানখেত। তখনো ধান পাকেনি। সবুজ গাছের সারির দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওরা যখন মামার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছয় তখন ভরদুপুর। খাঁখাঁ রোদ ছড়িয়ে আছে গ্রামজুড়ে। চারজনকে দেখে দৌড়ে আসে বাড়ির ছেলেমেয়েরা।

মেহমান এসেছে, মেহমান এসেছে।

ফুপু আসেন।

কেউ কেউ চন্দ্রাবতীর হাত ধরে টেনে আনে। মেয়েরা লাফিয়ে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মায়ের চোখের জল মেয়েদের মাথার ওপর চুপটাপ ঝরে। দূরে দাঁড়িয়ে থাকে বাউলা। এমন একটি সুন্দর দৃশ্য ওর আগে দেখা হয়নি। ওর সঞ্চয়ে দৃশ্যটি গাঁথা হয়। একসময় মায়ের বুক থেকে মাথা তুলে শিউলি বলে, আম্মা ও আপনার গোলাপ। আপনার কোল আলো করে এসেছে।

গোলাপ! আয় বাবা। রাশিদুন হাত বাড়ায়। বাউলা এসে সালাম করে। পা জড়িয়ে ধরলে রাশিদুন বসে পড়ে, বলে, ছাড় ছাড়। পাগল ছেলে। বাউলা মাথা নিচু করে বলতে থাকে, আমার মা কে আমি তা জানি না। আমি যার সঙ্গে সংসার করব আপনি তার মা। সেজন্য আপনি আমার মা। আজ থেকে আমি একজন মা পেলাম। আর কখনও মা খুঁজব না। আপনি আমার মা খোঁজার শেষ মানুষ।

কথা বলে সরাসরি রাশিদুনের দিকে তাকায় বাউলা। রাশিদুন ওর সরল চেহারার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। এমন একটি ছেলেই কি শিউলির বাপ চেয়েছিল, নাকি অন্য কোন ছেলে? রাশিদুন তাকিয়েই থাকে।

আমার বিয়েতে আপনার যেতে হবে পরিমা।

রাশিদুন দ্রুত কণ্ঠে বলে, যাব যাব। আমি যাব। বলেই দু'হাতে বাউলাকে টেনে তোলে। ওর কাঁধে মাথা রাখে। তারপর কাঁদতে থাকে রাশিদুন। বড় বেশি বুক নিংড়ানো কান্না।

বিয়ের আগের দিন বাউলার সঙ্গে ফেলেযাওয়া বাড়ি তে আসে রাশিদুন।

চারদিকে বিয়ের উৎসবের ছোঁয়া। আত্মীয়-স্বজন এসেছে। নানা ব্যস্ততা চারদিকে। বাউলা তাকে ভ্যানগাড়ি থেকে নামায়। জয়নুল মিয়া দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রাশিদুনের দিকে। রশিদুনের মনে হয় জয়নুল মিয়ার চোখে আলোর ঝিলিক। দৃষ্টি ফিরিয়ে রাশিদুন বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। পেছনে বাউলা।

জয়নুল মিয়ার বুকের ভেতরে খুশির উচ্ছ্বাস। ভাবে, পঁচিশ বছর আগের রাশিদুন ফিরে এসেছে ওর কাছে। ঠিক সেভাবে যেভাবে সেদিন এসেছিল। জয়নুল দু'হাতে বুক চেপে চারদিকে তাকায়। ভাবে চারদিকে জ্যোৎস্না। আজ পূর্ণিমা।

• সমাপ্ত

সেলিনা হোসেন কথাসাহিত্যিক

বাংলাদেশভারত মৈত্রী সমিতি
হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd
b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India
ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিস্মৃতপ্রায় বিজ্ঞানী রাজচন্দ্র বসু

নিশীথকুমার পাল

বি এ পরীক্ষার আর মাত্র ক'দিন বাকি। এজন্য রাজচন্দ্রের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এই পরীক্ষায় যদি ফল ভাল না হয় তবে সর্বনাশ! তাঁর উচ্চশিক্ষা লাভের স্বপ্ন হয়ে উঠবে আকাশকুসুম। এখন সন্ধ্যে। রাজচন্দ্র তাড়াতাড়ি সেজের বাতিতে একটু তেল ঢেলে দেন। এত অস্পষ্ট আলো যে ভাল করে অক্ষরগুলো চোখেই পড়ছে না! ছোট বোন একটু বাধো বাধো গলায় জানায়, ঘরে এক মুঠোও চাল নেই। কি যে রান্না হবে...

একটা ছোট শ্বাস ফেলে রাজচন্দ্র বই ছেড়ে উঠে পড়েন। সত্যিইতো, টানা ক'মাস তিনি প্রাইভেট টিউশনি ছেড়ে ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া করছেন। এদিকে সংসারের চাকা যে কি করে চলছে তা খেয়ালই করেননি।

রাজচন্দ্রের মাথার ওপর সংসারের সম্পূর্ণ বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তিন বছর আগেই বাবামা দু'জনেই পৃথিবী ছেড়েছেন। মহামারীর কবলে মায়ের মৃত্যুর পর বাবাও বেশিদিন বাঁচেননি। দুই পুত্র এবং দুই কন্যাকে একেবারে অপরিণত অবস্থায় রেখে চলে গেছেন। সবার বড় রাজচন্দ্র। তিনি কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। পরম যত্ন ও সতর্কতায় ভাইবোনদের আগলে রাখেন। কলেজে যেটুকু সময় যায়, না হলে বাকি সময়ে যত পারেন প্রাইভেট টিউশনি করেন। এই ছাত্র পড়ানোর টাকাতেই রাজচন্দ্র ভাইবোনদের কোনওমতে বড় করে তুলছেন এবং নিজেও বড় হচ্ছেন। পড়া থেকে উঠে এঘরওঘর ঘু রে বেড়ান রাজচন্দ্র। পকেটে যে একটা আধলাও নেই! চালটা

স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করে শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি পান তিনি, ভর্তি হন বি এ ক্লাসে। সেই বি এ পরীক্ষাতেও অঙ্কে দারুণ নম্বর পেয়ে রাজচন্দ্র দিলি-চলে আসেন। সময়টা ১৯২৫ সাল। সেখানে এম এ ক্লাসে ঢুকেই তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। যে বিশুদ্ধ গণিত তাঁর প্রাণবায়ু সেই বিষয়টি পড়াবার কোন ব্যবস্থাই তখন দিলিতে নেই। অনন্যোপায় রাজচন্দ্র মুখ ভার করে দিলির হিন্দু কলেজে ফলিত গণিতের ক্লাসই করতে থাকেন।

ততদিনে বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে তাঁর মনে চলছে প্রচণ্ড ভাঙাগড়া। ফিশার, টেরি, ইউলার ও পাম্পকিনের মত বিশুদ্ধ গণিতবিজ্ঞানীর গবেষণা রাজচন্দ্রের মনে জাগিয়েছে নতুন আলো। তিনিও কি গণিতবিশ্বকে নতুন কিছু দিয়ে যেতে পারবেন না এঁদের মত? এসব প্রশ্নে সদা সর্বদা মন থাকে আচ্ছন্ন, এতসব হ্যাপা সামলানো, বাস্তব জীবনের এত চোখ রাঙানি, তবু অঙ্ক গবেষণায় যেন ঢিলেমি নেই এতটুকু।

আসবেই বা কোথা থেকে? হঠাৎ বাবার পুরনো আলমারি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেয়ে গেলেন এক বোতল কুইনাইন। সে-সময় প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, ওষুধপত্রের আকাল সর্বত্র। ওই কুইনাইনই রাজচন্দ্রকে সমাধান বাতলে দেয়। তিনি নিকটবর্তী এক ওষুধের দোকানে ওই বোতলটি বিক্রি করে এলেন। টাকা নিয়ে ফিরতে ফিরতে রাজচন্দ্রের মুখে হাসি ফোটে। এই টাকায় সংসার বেশ ক'দিন দিব্যি চলবে।

এই হলেন রাজচন্দ্র বসু। যিনি উত্তরকালে সারা পৃথিবীকে গণিত ও পরিসংখ্যানের নতুন নতুন আবিষ্কারে রোমাঞ্চিত করেছেন, ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে বিশ্ববিজ্ঞানে খ্যাতকীর্ত হয়েছেন।

১৯০১ সালের ১৯ জুন মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ শহরে রাজচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের কিছুদিন পরেই রাজচন্দ্রের বাবা কর্মোপলক্ষে রোটাক শহরে চলে আসেন। এখানেই রাজচন্দ্রের ছেলেবেলা কাটে। বাবা পেশায় ছিলেন একজন চিকিৎসক। রাজচন্দ্রই পরিবারের প্রথম সন্তান। তাই ভালভাবেই গড়ে উঠেছিল তাঁর শৈশব। ছেলেটির অসম্ভব মেধা ও পড়শোনার প্রতি আগ্রহ। যে দেখে সেই অবাক হয়। তার ওপর যে বিষয়টিকে দেখলে শিশুরা জুজুর চেয়ে বেশি ভয় পায়, সেই অঙ্কেই যেন ছেলের বেশি ভাব-ভালবাসা। তা বলে যে অন্য বিষয়েও হেলাফেলা তা নয়, সব বিষয়েই সবার ওপরে। স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষায় 'অদ্বিতীয়' রাজচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে শিক্ষক মশাইদের আশাভরসার শেষ নেই। এই ছেলেই যে ভবিষ্যতে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে, তা নিয়ে কারো সংশয় নেই।

স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করে শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি পান তিনি, ভর্তি হন বি এ ক্লাশে। সেই বি এ পরীক্ষাতেও অঙ্কে দারুণ নম্বর পেয়ে রাজচন্দ্র দিলি-চলে আসেন। সময়টা ১৯২৫ সাল। সেখানে এম এ ক্লাশে ঢুকেই তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। যে বিশুদ্ধ গণিত তাঁর প্রাণবায়ু সেই বিষয়টি পড়াবার কোন ব্যবস্থাই তখন দিলিতে নেই। অনন্যোপায় রাজচন্দ্র মুখ ভার করে দিলির হিন্দু কলেজে ফলিত গণিতের ক্লাশই করতে থাকেন। পরীক্ষায় বরাবরের মত এবারও ভাল নম্বর পেলেন। ভাল নম্বর পেলে হবে কি, রাজচন্দ্রের মনে কিন্তু এতটুকু শান্তি নেই। তিনি যে বিশুদ্ধ গণিতেরই ওপর মহলে ঢুকতে চান। ফলিত গণিতে তাঁর যে এতটুকুও আকর্ষণ নেই!

কিন্তু মনে যার গভীর ইচ্ছা, উপায় তাঁর হয়েই যায় কোনও না কোনওভাবেই। দিলিতে তিনি ধনিকচূড়ামণি শেঠ কেদারনাথ গোয়েঙ্কার ছোট ভাইকে অঙ্ক শেখাতেন। সেই মনের গভীর অশান্তির সময়ে হঠাৎ একদিন কেদারনাথ ডেকে পাঠান রাজচন্দ্রকে। দেখা করতেই তিনি জানান যদি রাজচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ গণিতে এম এ পড়তে চান তবে কেদারনাথ তাঁকে আর্থিক সহায়তা করতে প্রস্তুত। এ যেন হাতে চাঁদ পাওয়া! সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন রাজচন্দ্র এবং কেদারনাথের সঙ্গে ক'দিন বাদেই কলকাতায় চলে এলেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ গণিত বিভাগে ভর্তি হয়ে গেলেন। বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে শুরু হল তাঁর উচ্চশিক্ষা। কিন্তু পদে পদে আর্থিক বাধা এসে ভিড় করে। টিউশনি না করলে বাড়িতে টাকা পাঠাবেন কি করে! ভাইবোনদের মানুষ করতেও তো হবে! ঠিক এসময়েই এক সুবর্ণ সুযোগ এসে যায়। সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় নামে এক গণিত গবেষকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। গণিত বিজ্ঞানী শ্যামাদাস রাজচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে দারুণ মুগ্ধ। বুঝলেন, এ এক অনন্য গণিত প্রতিভা। অভাবের অসুখে যেন এমন প্রতিভার অপমৃত্যু না হয়, সে কারণেই তিনি রাজচন্দ্রকে নিজের বাড়িতে ডেকে আনেন। থাকার জন্য একটা ঘরও ছেড়ে দেন। তাঁর নিজের ছিল অঙ্কের বিশাল লাইব্রেরি। নির্দ্বিধায় লাইব্রেরিটিও তিনি রাজচন্দ্রকে যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমতি দেন। এই শ্যামাদাসের তত্ত্বাবধানেই রাজচন্দ্রের জীবন যেন একটা মোড় ঘোরে। তাঁর বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে নানা তত্ত্বমূলক ভাবনা ও গবেষণা দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে।

১৯২৭ সাল। রাজচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশুদ্ধ গণিতে প্রথম শ্রেণী পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। এবার আর নিছক পড়াশোনার মধ্যে ডুবে থাকা নয়, চাকরি চাই। কিন্তু বিশুদ্ধ গণিতের এই মহাপ্রতিভাবান ছেলেটি শত চেষ্টা করেও একটা কেরানির চাকরি পর্যন্ত খুঁজে পান না। সর্বত্রই একই কথা, তিনি নাকি অতিরিক্ত যোগ্য। সবাই যোগ্য ব্যক্তিকেই চায়– অতিরিক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ নিয়ে তাঁরা কী করবেন!

কিন্তু নিজের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রশ্নটিও তো আছে। তাই সেই ছাত্র পড়ানো। রাজচন্দ্রের বড় ক্লান্তিকর মনে হয় এমন একঘেয়ে জীবন।

এদিকে ততদিনে বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে তাঁর মনে চলছে প্রচ- ভাঙাগড়া। ফিশার, টেরি, ইউলার ও পাম্পকিনের মত বিশুদ্ধ গণিতবিজ্ঞানীর গবেষণা রাজচন্দ্রের মনে জাগিয়েছে নতুন আলো। তিনিও কি গণিতবিশ্বকে নতুন কিছু দিয়ে যেতে পারবেন না এঁদের মত? এসব প্রশ্নে সদা সর্বদা মন থাকে আচ্ছন্ন, এতসব হ্যাপা সামলানো, বাস্তব জীবনের এত চোখ রাঙানি, তবু অঙ্ক গবেষণায় যেন ঢিলেমি নেই এতটুকু। তবে জ্যামিতি নিয়েই এই পর্বে রাজচন্দ্র যেন মেতে আছেন বেশি।

দেখতে দেখতে আরও পাঁচ বছর কেটে যায়, আসে ১৯৩২ সাল। সে সময়েই বলা যায় রাজচন্দ্রের গণিত-গবেষণার সর্বাপেক্ষা উলেখযোগ্য পরিবর্তনটি আসে। অবশ্য চাকরি একটা পেয়েছিলেন তখন, কলকাতার আশুতোষ কলেজে গণিতের অধ্যাপনা। সেসময় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের 'সর্বাধিনায়ক' জগদ্বিখ্যাত পরিসংখ্যান বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি তখন সবে 'পরিচালক'রূপে এই নবপ্রতিষ্ঠিত পরিসংখ্যান ভবনটির কার্যভার গ্রহণ করেছেন। সারা ভারত হাতড়ে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন প্রতিভাবান পরিসংখ্যান বিজ্ঞানীদের। আর যোগ্য ব্যক্তিদের সাদরে চাকরি দিয়ে নিয়ে আসছেন দেশের নবনির্মিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে। ঠিক এই সময়েই প্রশান্তচন্দ্রের চোখ পড়ল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত রাজচন্দ্রের দিকে। প্রশান্তচন্দ্র

উনিশ শতকের বিখ্যাত গণিতবিজ্ঞানী লিওনার্ড ইউলারের একটি গাণিতিক কনজেকচার বা অনুমান। ইউলারের অনুমানটি যে অভ্রান্ত নয়, রাজচন্দ্র তা প্রমাণ করে দিলেন। ইউলারের গাণিতিক প্রহেলিকাটি একটি বর্গ নিয়ে। বলা যায়, তা ইউলারের ম্যাজিক বর্গ। এই জাদু বর্গের বিশেষত্ব হল, যেখানে লম্বালম্বি (কলাম) ও আড়াআড়ি (রো) দু'দিকেই ঘরের সংখ্যা হবে সমান।

তখনই ভাল চাকরির প্রস্তাব দিয়ে রাজচন্দ্রকে তাঁর গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানালেন। রাজচন্দ্রের কাছে তখন চাকরি মানেই সাত রাজার ধন এক মাণিক। তবু তিনি তৎক্ষণাৎ চাকরিতে যোগদানের প্রস্তাবে রাজি হতে পারছেন না। কারণটিও স্পষ্ট। রাজচন্দ্র বিশুদ্ধ গণিতের মানুষ ও জ্যামিতিগ্র বেষক, অথচ যেখানে চাকরি করতে যেতে হবে সে জায়গাটি পরিসংখ্যান গবেষণার তীর্থ। পরিসংখ্যান যদিও গণিতনির্ভর, তবু জ্যামিতির সঙ্গে তো তেমন সম্পর্ক নেই। তার ওপর পরিসংখ্যানের পণ্ড জা নেন না। পরিসংখ্যানের আবহে গিয়ে তিনি পথ হারাবেন না তো!

রাজচন্দ্রের অমূলক ভয় দেখে আশ্বাস দেন প্রশান্তচন্দ্র। প্রতিশ্রুতি দেন, তিনিই রাজচন্দ্রকে পরিসংখ্যানের পফ শেখাবেন। প্রতিশ্রুতি যখন পাওয়া গেল, তখন আর বৃথা আশংকা কেন?

ভারতীয় পরিসংখ্যান গবেষণা ভবনে ঢুকেই পড়লেন রাজচন্দ্র। সেখানে ঢুকে একটা নতুন জীবনের সন্ধান পেলেন তিনি। একদিকে পরিসংখ্যানের নানা বইপত্র পড়েন, গবেষণাপত্র ঘাঁটেন ও প্রশান্তচন্দ্রের ক্লাশ করেন, তেমনই অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাশ নেন, চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দেন পরিসংখ্যানের মূলটিকে। ছাত্রছাত্রীরা অভিভূতের মত তা শুনে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর অধ্যাপনা ছাত্রছাত্রীদের মন কেড়ে নেয়।

এই সময়েই রাজচন্দ্রের প্রতিভার ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটে। গণিতবিজ্ঞানীর সৃষ্টিমুখর মনে পরিসংখ্যান যেন এক নতুন শিল্পোন্মাদনা জাগায়। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ছেড়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন ১৯৪০ সালে। ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানের নতুন বিভাগ গড়ে উঠেছে। রাজচন্দ্র নতুন বিভাগের 'প্রধান অধ্যাপক' হয়ে যোগ দেন। ততদিনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে 'ডি লিট' করেছেন।

১৯৪৯ সাল, রাজচন্দ্রের বয়স তখন আটচল্লিশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান তিনি। স্বাধীনতা লাভের দু'বছরের মধ্যেই তিনি দেশ ছেড়ে চলে যাবেন, এ যেন ভাবাই যায় না। তবে যাঁরা রাজচন্দ্রকে ভালভাবে জানেন তাঁরা রাজচন্দ্রের এই বিদেশবাসের অন্য মানে করবেন না! তিনি বিদেশ যান কেবলমাত্র একটি স্বার্থকে মনে রেখেই, তা হল বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে সর্বক্ষণ বিভোর থাকবার সুযোগ। তা গেলেনও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে যোগ দেন রাজচন্দ্র। ধীরে ধীরে তাঁর গণিতের 'বিশুদ্ধ' গবেষণা সারা পৃথিবীর বাঘা বাঘা গণিতবিদদের নজর কাড়ে। পরে নর্থ ক্যারোলিনা ছেড়ে তিনি চলে আসেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরিদর্শক প্রধান অধ্যাপক হিসেবেও কাজ করেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

রাজচন্দ্রের গণিত গবেষণার জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কার দুটির একটি হল– উনিশ শতকের বিখ্যাত গণিতবিজ্ঞানী লিওনার্ড ইউলারের একটি গাণিতিক কনজেকচার বা অনুমান। ইউলারের অনুমানটি যে অভ্রান্ত নয়, রাজচন্দ্র তা প্রমাণ করে দিলেন। ইউলারের গাণিতিক প্রহেলিকাটি একটি বর্গ নিয়ে। বলা যায়, তা ইউলারের ম্যাজিক বর্গ। এই জাদু বর্গের বিশেষত্ব হল, যেখানে লম্বালম্বি (কলাম) ও আড়াআড়ি (রো) দু'দিকেই ঘরের সংখ্যা হবে সমান। এসব ঘরে ল্যাটিন বা গ্রিক বা অন্য যে কোন ভাষার অক্ষর যদি মাত্র 'একবার' করে এনে বসানো যায়, তবে কলাম ও রো উভয় দিক থেকেই তা হবে সমান। সুইস গণিতবিদ ইউলারের এই জগদ্বিখ্যাত গাণিতিক কনজেকচার বা অনুমানটিকেই রাজচন্দ্র ও তাঁর দুই ছাত্র শ্রীখ- ও পার্কার ভুল প্রমাণিত করেন।

ইউলারের মজার খেলাকে রাজচন্দ্রই সর্বপ্রথম বৃহত্তর গবেষণার সীমানায় স্থানান্তরিত করেন। জেনেটিকের মত ফলিত জীববিজ্ঞানেও শুরু হয়ে যায় রাজচন্দ্রকৃত এই জাদু বর্গের সংশোধিত রূপটির চর্চা। ধীরে ধীরে কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, জীববিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার নানা গবেষণাতেও গবেষকরা রাজচন্দ্রের এই 'আধুনিক' জাদু বর্গটিকে সাদরে গ্রহণ করেন।

রাজচন্দ্রের দ্বিতীয় জগদ্বিখ্যাত গবেষণাটি টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত। টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক ইতালির পদার্থবিদ মার্কনি হলেও, এই টেলিব্যবস্থার যুগান্তর আনেন সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে অপর এক বিজ্ঞানী, তিনি এমএফবি মর্স। মর্স প্রবর্তিত সংকেত পদ্ধতি টেলিযোগাযোগে এক বৈপস্নবিক পরিবর্তন আনে। তারবার্তা পাঠাতে যে সংকেত পদ্ধতি আধুনিক টেলিযোগাযোগে ব্যবহার করা হয় তার নাম মর্স কোড। এ বিষয়ে রাজচন্দ্রের গবেষণাটি ছিল 'নয়েজ' বা গোলমাল নিয়ে। তিনি তাঁর বিন্যাসতত্ত্ব ও পরিকল্পিত জ্যামিতির সাহায্যে এমন একটি নতুন পদ্ধতি বানান, যেখানে যৎসামান্য টেলিবিভ্রাট আর রইল না। সারা পৃথিবীতে রাজচন্দ্রের এই মর্স কোড সংশোধনকে সর্বপ্রথম কাজে লাগায় ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির লিঙ্কন ল্যাবরেটরি এবং অসাধারণ ফল পায়। জ্যামিতির ওপরও রাজচন্দ্র বহু গবেষণা ও আবিষ্কার করেন। তাঁর 'বহুমাত্রিক জ্যামিতি'র তত্ত্বটি তো জগদ্বিখ্যাত! এই তত্ত্বটি 'বোস-বাৎকে তত্ত্ব' নামে অমর হয়ে আছে। রাজচন্দ্রের এই বহুমাত্রিক জ্যামিতি উত্তরকালে হ্যামিল্টন, জেকবি, গিবস প্রমুখ গণিতবিদদের নবতর সত্যের বিশাল আঙ্গিনায় উপস্থিত হতে প্রভূত সাহায্য করেছে।

১৯৭৬ সাল। রাজচন্দ্র তাঁর অসাধারণ গণিত গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ মার্কিন বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির মাননীয় সভ্য নির্বাচিত হন। গোটা বিশ্বের কাছে রাজচন্দ্র প্রমাণ করে দিয়েছেন ভারতীয় মনীষার আলোর প্রাখর্য এখনও অস্ত যায়নি। রাজচন্দ্র ভারতীয় গণিত সাধনার এক বিস্ময়কর আধুনিকতা, যে সাধনা চলে আসছে আর্যভট্টের কাল থেকেই। ১৯৮৭ সালের ৩১ অক্টোবর এই বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ কলোরাডোর ফোর্ট কলিন্সে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

নিশীথকুমার পাল শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

রাজচন্দ্রের এই মর্স কোড সংশোধনকে সর্বপ্রথম কাজে লাগায় ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির লিঙ্কন ল্যাবরেটরি এবং অসাধারণ ফল পায়। জ্যামিতির ওপরও রাজচন্দ্র বহু গবেষণা ও আবিষ্কার করেন। তাঁর 'বহুমাত্রিক জ্যামিতি'র তত্ত্বটি তো জগদ্বিখ্যাত! এই তত্ত্বটি 'বোস-বাৎকে তত্ত্ব' নামে অমর হয়ে আছে। রাজচন্দ্রের এই বহুমাত্রিক জ্যামিতি উত্তরকালে হ্যামিল্টন, জেকবি, গিবস প্রমুখ গণিতবিদদের নবতর সত্যের বিশাল আঙ্গিনায় উপস্থিত হতে প্রভূত সাহায্য করেছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প

পুনর্কথন ড. দুলাল ভৌমিক

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি শাখা। নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সাহিত্যের সৃষ্টি। শিশুকি শোরযুবাব ৃদ্ধ সব বয়সের মানুষই এ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে। মানুষের পাশাপাশি মনুষ্যেতর প্রাণী, এমনকি জড়বস্তুও এতে চরিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহজসরল ভাষায় এমন আশ্চর্য ভঙ্গিতে গল্পগুলো রচিত যে, অতি সহজেই সেগুলো পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করে।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন ও সার্থক গ্রন্থ হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা তার কিছু পরে বিষ্ণুশর্মা এটি রচনা করেন। এর অনুকরণে পরবর্তীকালে নারায়ণ শর্মা রচনা করেন হিতোপদেশ। এছাড়া আরো কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, শিবদাসের বেতালপঞ্চবিংশতি, দক্ষীর দশকুমারচরিত, সোমদেব ভট্টর কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া আরো একটি উলেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এটি মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে কথিত হয়। সে হিসেবে এর রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক। এই দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাই রাজা বি ক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে বাংলা ভাষায় নতুনভাবে উপস্থাপিত হল।

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে রচিত। তাঁর বিভিন্ন গুণের কথা এতে বর্ণিত হয়েছে।

বিক্রমাদিত্যরা ছিলেন দুই ভাই। অগ্রজ ভর্তৃহরি– উজ্জয়িনীর রাজা। একদিন তিনি অনুজ বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য রাজ্যের সকলকে পরম সমাদরে পালন করে সকলের প্রিয়ভাজন হন।

একদিন প্রত্যুষে এক দিগম্বর সন্ন্যাসী আসেন তাঁর কাছে। তিনি মহাশ্মশানে এক মহাহোম করবেন। তাই যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহণে রাজাকে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য সর্বপ্রকারে সন্ন্যাসীকে সাহায্য করেন এবং সন্ন্যাসী অত্যন্ত প্রীত হন। তাঁর আশীর্বাদে বিক্রমাদিত্য বেতালসিদ্ধ হন। বেতাল হল প্রেতাত্মা এবং সর্বকাজে পারদর্শী।

এদিকে ঋষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় রত। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে হবে। একা জে কে সমর্থ– রম্ভা না উর্বশী? দেবরাজ ইন্দ্র মহাচিন্তায় পড়লেন। দেবর্ষি নারদ বললেন: এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্য।

দেবরাজের নির্দেশে তাঁর সারথি মাতলি পুষ্পকরথ নিয়ে মর্তে বিক্রমাদিত্যের নিকট হাজির হলেন। মাতলির মুখে সব শুনে বিক্রমাদিত্য রথে চড়ে স্বর্গে গেলেন– দেবরাজের সভায়। সেখানে শুরু হল রম্ভাউর্বশীর নৃত্য-গীতের প্রতিযোগিতা। কেউ কম নন। তবে বিক্রমাদিত্যের সূক্ষ্ম বিচারে উর্বশী অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন।

দেবরাজ ভীষণ খুশি হলেন বিক্রমাদিত্যের বিচারের ক্ষমতা দেখে। তাই পুরস্কারস্বরূপ তিনি বিক্রমাদিত্যকে মণিমাণিক্যখচিত একটি ব হুমূল্য রত্নসিংহাসন উপহার দিলেন। বিক্রমাদিত্য সিংহাসন নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন এবং কোন এক শুভদিনে শুভক্ষণে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। আর সুখে প্রজাপালন করতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন রাজ্যে ভীষণ বিপদ দেখা দিল। ধূমকেতুর উদয়, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, প্রলয়ঝড়– কোনটাই বাদ নেই। রাজা এর কারণ জানতে চাইলেন। তিনি দৈবজ্ঞদের ডাকলেন। তাঁরা বললেন: সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প হলে কিংবা অগ্ন্যুৎপাত পীতবর্ণযুক্ত হলে রাজার প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়।

একথা শুনে রাজার তখন অতীতের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি একবার মহাশক্তির সাধনা করেছিলেন। সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে বর দিতে চাইলেন। রাজা অমরত্বের বর চাইলেন। দেবী বললেন: জগতে কেউ অমর নয়। তবে একমাত্র আড়াই বছরের কন্যার গর্ভজাত পুত্রের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে।

বিক্রমাদিত্যের একথা শুনে দৈবজ্ঞরা বললেন: কোথাও আড়াই বছরের কন্যার পুত্র জন্মেছে কিনা তা অনুস ন্ধান করা প্রয়োজন।

বিক্রমাদিত্যের নির্দেশে বেতাল অনুসন্ধানে বের হল। কিছুদিনের মধ্যেই সে সঠিক খবর নিয়ে ফিরে এল। প্রতিষ্ঠা নগরে শেষনাগের ঔরসে আড়াই বছরের কন্যার গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। নাম তাঁর শালিবাহন। তিনি এখন কৈশোরে পদার্পণ করেছেন।

বেতালের কথা শুনে রাজার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। তিনি আর বিলম্ব না করে তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শালিবাহনের সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু ভবিতব্য অনুযায়ী এই শালিবাহনের হাতেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হল।

বিক্রমাদিত্য ছিলেন অপুত্রক। তাই তাঁর সভাপতি বললেন: অনুসন্ধান করা হোক রাজার কোন রানি অন্তঃসত্ত্বা কিনা।

অনুসন্ধানে জানা গেল– রানিদের মধ্যে একজনের গর্ভসঞ্চার হয়েছে। তখন সেই গর্ভস্থ সন্তানের নামে পারিষদবর্গ রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। দেবরাজ প্রদত্ত সিংহাসনটি শূন্যই পড়ে রইল।

কিছুদিন পরে পারিষদবর্গ এক দৈববাণী শুনতে পেলেন: যেহেতু এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত কেউ নেই, সেহেতু একে একটি পবিত্র স্থানে রাখা হোক।

দৈববাণী অনুযায়ী পারিষদবর্গ সিংহাসনটিকে একটি পবিত্র স্থানে রেখে দিলেন। কালক্রমে একদিন সিংহাসনটি মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল। সবাই ভুলেই গেল যে, এখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঐতিহ্যবাহী রত্নসিংহাসনটি ছিল। সেই জায়গাটি এখন কৃষিক্ষেত্র এবং এক ব্রাহ্মণ চাষির দখলে। তিনি ঐ জায়গায় একটি মাচা তৈরি করে তার উপর বসে খেত পাহারা দেন।

একদিন ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে বসে আছেন। এমন সময় মহারাজ ভোজ সসৈন্যে ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ বিনয়ের সঙ্গে বললেন: মহারাজ! আপনি আমার অতিথি। আপনার অশ্বগুলো ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত। ওগুলোকে আমার খেতে ছেড়ে দিন। ওরা যথেচ্ছ আহার গ্রহণ করুক।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা থামলেন এবং সৈন্যদের বললেন অশ্বগুলোকে ছেড়ে দিতে। সৈন্যরা তাই করল এবং অশ্বগুলো যথেচ্ছ খেতের ফসল খেতে লাগল।

এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচা থেকে নেমে এসে আর্তস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন: একি করছেন, মহারাজ! রাজা হয়ে প্রজা পীড়ন করছেন! দেখুনতো আপনার অশ্বগুলো আমার খেতের কিরূপ ক্ষতিসাধন করছে!

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা তো হতবাক। তিনি সৈন্যদের বললেন খেত থেকে অশ্বগুলো তুলে আনতে। সৈন্যরা তাই করল এবং রাজা চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচায় গিয়ে বসে আবার মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন: একি মহারাজ! আপনি চলে যাচ্ছেন যে? আপনি না আমার অতিথি? অতিথি বিরূপ হয়ে চলে গেলে আমার অমঙ্গল হবে। আপনি ইচ্ছেমত অশ্বগুলোকে খেতের ফসল খাওয়ান।

রাজা ভোজ এবার বিস্মিত হলেন ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে থাকলে একরকম আচরণ করেন, মাচা থেকে নামলে আবার অন্যরূপ ধারণ করেন। তিনি এর রহস্য ভেদ করার জন্য স্বয়ং মাচার উপরে গিয়ে বসলেন। তখন তিনি অনুভব করলেন– তাঁর মধ্যেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিনিও যেন তাঁর সমস্ত সম্পদ প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন। তিনি বুঝতে পারলেন– এই মাচার নিচে অলৌকিক কিছু একটা আছে। তিনি তখন মাচা থেকে নেমে এসে যথেষ্ট দাম দিয়ে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ঐ জায়গাটি কিনে নিলেন। যথাসময়ে মাটি খুঁড়ে দেখতে পেলেন একটি সিংহাসন। এটিই দেবরাজ প্রদত্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই রত্নসিংহাসন। ভোজরাজ যারপরনাই খুশি হলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সিংহাসনটি তিনি তুলতে পারলেন না। তারপর মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি যথাবিহিত যাগয জ্ঞাদির অনুষ্ঠান করলেন এবং তখন সিংহাসনটি আপনি উঠে এল। রাজা ভোজ অতি যত্নের সঙ্গে সিংহাসনটি রাজধানীতে নিয়ে এলেন। সিংহাসনে বত্রিশটি পুতুলের মূর্তি খোদিত ছিল। রাজা যখন পুতুলগুলোর মাথায় পা রেখে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিলেন, তখন প্রত্যেকটি পুতুল রাজা বিক্রমাদিত্যের শৌর্যবীর্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি সম্পর্কে একেকটি গল্প বলেছিল। এ থেকেই গ্রন্থের নাম হয়েছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এতে বত্রিশটি গল্প আছে। বর্তমান কালের পাঠকের উপযোগী করে গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে নতুনভাবে উপস্থাপিত হল। এ গল্পগুলো পড়লে পাঠকের মধ্যে, বিশেষত শিশুদের মধ্যে মহানুভবতা, পরোপকারিতা, দানশীলতা, ধৈর্য, শৌর্য, বীর্য, ঔদার্য, সাহসিকতা ইত্যাদির মনোভাব সৃষ্টি হবে।

এ পর্যন্ত আমরা সাতটি পুতুলের গল্প শুনেছি। এবার শোনা যাক অষ্টম, নবম ও দশম পুতুলের গল্প:

অষ্টম পুতুলের গল্প

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে উঠতে গেলেন। তিনি যখন অষ্টম পুতুলের মাথায় পা রাখলেন, তখন পুতুলটি বলে উঠল: রাজন্! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় পরহিতব্রতী হন, তাহলে এই সিংহাসনে বসার যোগ্য হবেন।

ভোজরাজ বললেন: কি সেই ঘটনা?

পুতুলটি বলতে লাগল: একদিন কাশ্মীরী এক পর্যটক এলেন বিক্রমাদিত্যের সভায়। মহারাজ তাঁর যথাসাধ্য আপ্যায়ন করলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে পর্যটক বললেন: কাশ্মীরের এক সদাশয় বণিক জনগণের সুবিধার জন্য পঞ্চক্রোশব্যাপী এক বিশাল দীর্ঘিকা খনন করিয়েছেন কিন্তু তাতে জল উঠছে না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ডেকে অনেক যাগ-যজ্ঞ করলেন। তাতেও কোন ফল হল না। বণিক খুব হতাশ হলেন। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন।

এমন সময় এক দৈববাণী হল: বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত কোন মহাপুরুষ যদি নিজের রক্ত দান করে, তাহলে জলদেবতা প্রসন্ন হবেন এবং এই দীর্ঘিকা জলে পূর্ণ হবে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য একথা শুনে ভাবলেন: দৈবজ্ঞদের মতে আমি বত্রিশ লক্ষণযুক্ত কিন্তু এ জীবন তো ক্ষণস্থায়ী। জন্মেছি যখন তখন মরতে তো একদিন হবেই। তাই আমার জীবনের বিনিময়ে যদি ঐ দীর্ঘিকায় জল ওঠে, তাহলে বহুকাল শতশত মানুষের তৃষ্ণা নিবারিত হবে।

এরূপ চিন্তা করে মহারাজ তক্ষুণি তরবারি নিয়ে যাত্রা করলেন। দীর্ঘিকার পাড়ে পৌঁছে তরবারি হাতে নিয়ে তিনি জলদেবতার উদ্দেশে বললেন: হে জলদেতা! এই আমি আমার শিরশ্ছেদ করে রক্ত দিচ্ছি। আমার রক্তের বিনিময়ে আপনি এই দীর্ঘিকা জলে পূর্ণ করে দিন।

এই বলে তিনি যখন শিরশ্ছেদ করার জন্য তরবারি উত্তোলন করেছেন, তখন জলদেবতা তাঁর হাত ধরে বললেন: তোমার আর রক্তদানের প্রয়োজন নেই। জনকল্যাণে তোমার এই আত্মনিবেদনের উদ্যোগ দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পেছনে তাকালে দেখবে দীর্ঘিকা জলে পূর্ণ হয়ে গেছে।

জলদেবতার কথা শুনে মহারাজ তরবারি খাপে ভরে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখেন বিশাল সেই দীর্ঘিকা সুমিষ্ট টলটলে জলে পূর্ণ হয়ে গেছে। তা দেখে মনের আনন্দে তিনি নিজরাজ্যে ফিরে এলেন।

বিক্রমাদিত্যের জনকল্যাণব্রতের এই কাহিনি শেষ করে পুতুলটি বলল: রাজন্! আপনি যদি মহারাজের মত এরূপ জনহিতব্রতী হন, তবে এই সিংহাসনে আরোহণ করুন।

পুত্তলিকার মুখে বিক্রমাদিত্যের এই কাহিনি শুনে ভোজরাজ নির্বাক হয়ে রইলেন।

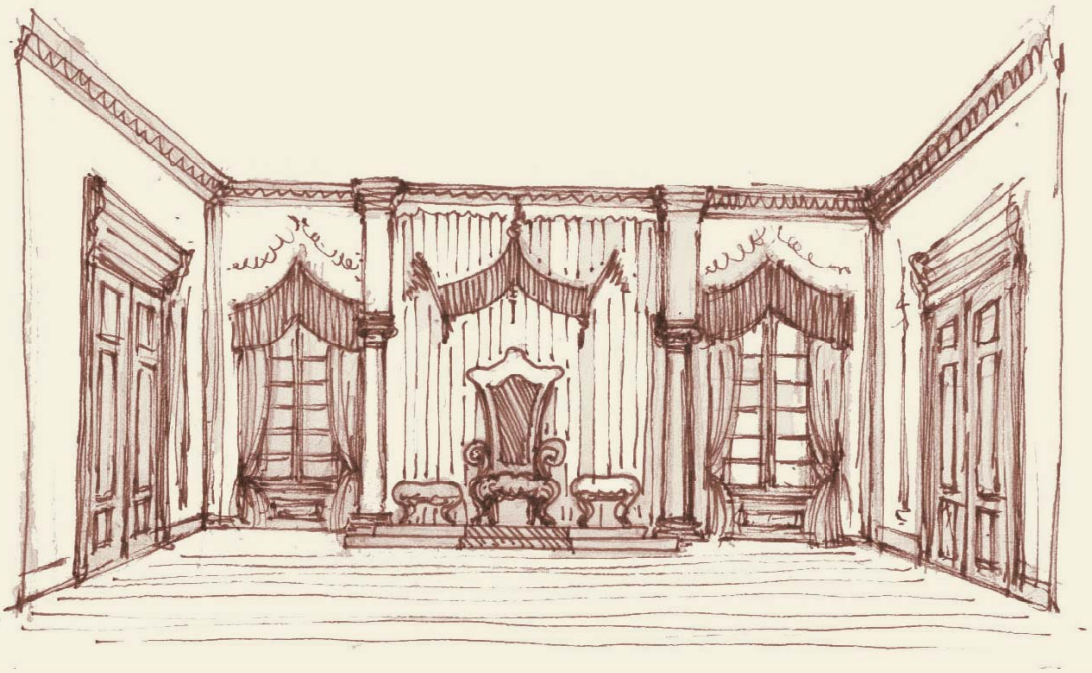

নবম পুতুলের গল্প

ভোজরাজ এবার নবম পুত্তলিকার মাথায় পা দিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করতে গেলেন। অমনি পুত্তলিকাটি বলে উঠল: রাজন্! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সাহসী ও বীর হন, তাহলে এই সিংহাসনে আরোহণ করুন।

ভোজরাজ বলেলেন: মহারাজ বিক্রমাদিত্য কিরূপ সাহসী ও বীর ছিলেন?

পুত্তলিকাটি বলল: তবে শুনুন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বে কমলাকর নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক ছিল। তার পিতার ছিল অগাধ সম্পদ। কিন্তু কমলাকর ছিল নিষ্কর্মা। কেবল পিতার অর্থ খরচ করত। তাই পিতা একদিন তাকে ভর্ৎসনা করে বললেন: ব্রাহ্মণের পুত্র হয়ে তুমি লেখাপড়া করলে না; কেবল যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করে পশুর ন্যায় ভোগ-সুখে দিন কাটাচ্ছ। এমন জীবন যাপনে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।

পিতার এই তিরস্কারে কমলাকরের মনে তীব্র খেদ জন্মাল। সে প্রতিজ্ঞা করল– বিদেশ গিয়ে বিদ্যার্জন করে তবেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে। তারপর একদিন চলে গেল কাশ্মীর। সেখানে বিভিন্ন আচার্যের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করে সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। প্রত্যাবর্তনকালে কাঞ্চী নামক দেশে এক আশ্চর্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করল। সেখানকার এক মনোমোহিনী নারীকে যে দেখে সে-ই কামার্ত হয়ে ওঠে, নতুবা উন্মাদ হয়ে যায়। কেউ বা তার সঙ্গসুখ লাভ করতে চায় এবং রাতে তার পাশে শয়ন করে। এই সুযোগে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস এসে তাকে বধ করে এবং তার মাংস খায়।

কমলাকর দেশে ফিরে এ ঘটনা প্রচার করে। এক সময় মহারাজের কানেও কথাটি পৌঁছয়। মহারাজ মনে-মনে ভাবলেন– এভাবে এক রাক্ষসের হাতে নিরীহ মানুষদের মরতে দেওয়া যায় না। তাই তিনি কমলাকরকে সঙ্গে নিয়ে কাঞ্চী গেলেন এবং রাত্রিবেলা সেই নারীর ঘরে প্রবেশ করলেন। মহারাজকে দেখে নারীর কৌতূহল হল। সে মহারাজের পরিচয় জানতে চাইল। মহারাজ পরিচয় দিতেই নারী করজোড়ে বলল: মহারাজ! আপনার পদধূলি পেয়ে আমি ধন্য। কিন্তু আমার অনুরোধ– আপনি এখানে বেশিক্ষণ থাকবেন না। তা হলে ঐ রাক্ষসটা আপনাকে মেরে ফেলবে।

নারীর কথায় মহারাজ হেসে ফেলে বললেন: তোমার কোন ভয় নেই। আমার হাতে ওর আজ মৃত্যু অনিবার্য।

এই বলে মহারাজ ঘরের এক কোণে অন্ধকারে লুকিয়ে রইলেন। নারী বিছানায় শুয়ে আছে। গভীর রাতে সেই রাক্ষসটা ঘরে এসে ঢুকল। কিন্তু বিছানায় নারীর পাশে আর কাউকে দেখতে পেল না। তখন সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এমন সময় মহারাজ বেরিয়ে এসে তরবারি দিয়ে তার শিরশ্ছেদ করে ফেলেন। নারী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মহারাজকে বলল: আপনার এই বীরত্ব ও সাহসিকতা অতুলনীয়। আপনি আমায় এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসটার হাত থেকে বাঁচালেন। আমাকে নবজীবন দান করলেন। আপনার এ দানের কথা আমি কোনদিন ভুলব না।

পুত্তলিকার কথা শুনে ভোজরাজ নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দশম পুতুলের গল্প

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। দশম পুতুলের মাথায় যখনই পা রেখেছেন, পুতুলটি বলে উঠল: রাজন্! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আর্তের প্রতি দয়াশীল ও মহানুভব হন, তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

ভোজরাজ বললেন: কি রকম?

পুতুলটি বলল: মহারাজ একদিন রাজদরবারে বসে আছেন। এমন সময় এক যোগী এসে উপস্থিত হলেন। মহারাজ তাঁর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বললেন: হে যোগীবর, আমি কঠোর সাধনায় ব্রতী হতে চাই। আপনি আমায় উপদেশ দিন।

যোগী তাঁকে মন্ত্র দান করে বললেন: মহারাজ, আপনি এই সাধনায় সিদ্ধ হলে এক দিব্য ফল লাভ করবেন। সেই ফল ভক্ষণ করলে সমস্ত রকম জরা-ব্যাধি থেকে মুক্ত হবেন।

যোগীর কথামত মহারাজ কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হলেন। দীর্ঘ এক বছর সাধনার পর একদিন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মহারাজকে একটি দিব্য ফল দিয়ে আবার অন্তর্হিত হলেন।

মহারাজ ফলটি নিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করছেন। এমন সময় পথে পড়ল এক কুষ্ঠরোগী। সে মহারাজকে বলল: মহারাজ! আপনি পিতৃতুল্য। প্রজাদের সকল কষ্টই আপনি দূর করেন। আমি একজন কুষ্ঠরোগী। কেউ আমায় দেখতে পারে না। আপন-পর সবাই আমায় ঘৃণা করে। আপনি আমায় এ ব্যাধি থেকে মুক্ত করুন।

মহারাজ একথা শুনে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সেই দিব্য ফলটি তাকে দিয়ে বললেন: এটি খেলে তুমি সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

একথা বলে তিনি শূন্যহাতে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন।

পুতুলটি এই কাহিনি শেষ করে ভোজরাজকে বলল: রাজন! আপনি কি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আর্তের প্রতি এমন দয়াশীল ও মহানুভব? যদি তাই হন তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

পুতুলটির কথা শুনে রাজা আর পা বাড়ালেন না।

● পরবর্তী সংখ্যায়

ড. দুলাল ভৌমিক শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

Saffola Active

Introducing new 'Saffola Active', blended edible vegetable oil. It brings you the benefits of 2 oils (80% Rice Bran & 20% Soyabean) in one. Saffola Active is more effective for heart than any other ordinary vegetable oil. And it promises you healthy heart and healthy life.

Triple Action (Omega3, Vitamin E, Oryzanol)

Saffola Active is enriched with **Triple Action Formula** that contains the goodness of Omega 3, Oryzanol and Vitamin E which help to reduce LDL (bad cholesterol) levels.

LOSORB™ TECHNOLOGY

Saffola Active comes with patented **LOSORB technology**. Foods cooked in Saffola Active have lower fats due to lower absorption of oils while cooking.

5 Antioxidant

Saffola Active also has the **goodness of 5 antioxidants** which keeps your heart and life healthy.

So, start using Saffola Active from today and keep your family healthy and always rejuvenized. Available in 1 litre and 5 litres jars.

marico

Healthy Heart
Healthy Life

সংস্কৃতি

মাটি কে রং

নাগাল্যান্ডের গ্রামে অনুপম সঙ্গীতানুষ্ঠান

অলোককুমার সেন

লিখতে বসেছি আমার সংগীতজীবনের প্রাপ্তির বিরলতম মনোমুগ্ধকর এক গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতির কথা। যে স্মৃতির এ্যালবামের নাম 'মাটি কে রং'। ২০১৫ সালের ১৪ থেকে ১৮ জানুয়ারি ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (আইজিসিসি) আমাকে সুযোগ করে দিয়েছিল ভারতের নাগাল্যান্ড প্রদেশের ডিমাপুর জেলার দিফুপার গ্রামে নর্থ ইস্ট জোন কালচারাল সেন্টারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে যোগ দেবার।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণপত্রসহ দরকারি কাগজপত্র হাতে পেয়ে বাংলাদেশ থেকে শুধু আমাকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে দেখে আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে যন্ত্রশিল্পী হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয় বিপ্লবকান্তি শর্মা, শাকিল মোহাম্মদ সাবির উদ্দিন (দিপন), সজলকুমার সাহা ও রূপতনু দাসশর্মাকে। ১৪ তারিখ রাত ৯.৪০এর এয়ার ইন্ডিয়া বিমানযোগে গভীর রাতে কলকাতায় পৌঁছে ডিমাপুর হাউসে রাত্রিযাপন করি। পরদিন সকাল ১০.০০টার অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে ডিমাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। আকাশযাত্রা রোমাঞ্চকর হয়ে উঠল ডিমাপুরের পাহাড়ি অঞ্চলে পৌঁছে। বিহঙ্গাবলোকনে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

নিচে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর বিমানের অভ্যন্তরে পণ্ডিত শিবকুমার শর্মার সন্তুরে আহীর ভৈরব– সত্যিই ভোলার নয়। স্থানীয় সময় বেলা একটায় বিমান অবতরণ করল ডিমাপুর বিমান বন্দরে। পাহাড়ি পরিবেশে ছোট্ট অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর– কোলাহলমুক্ত কিন্তু খুব পরিপাটি।

পৌঁছতেই আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে শ্রীমতী নারুলা দেবী গাড়িবহর নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। উষ্ণ অভিনন্দন দিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন অনুষ্ঠানস্থলের পরিবেশ ঘুরে দেখাতে। ‘মাটি কে রং’ অনুষ্ঠানের বড় বড় ব্যানার আর ফেস্টুনে দেখলাম আয়োজক ভারতসহ নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার ও বাংলাদেশের নাম বড় বড় করে লেখা। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণজুড়ে নাগাশিল্পীদের তৈরি কাঠের ভাস্কর্য আর ছোট ছোট খড়ের ছাউনি দিয়ে সারে সারে সাজানো বিপনী বিতান। সেখানে হস্তশিল্প, শিশুদের খেলনা, পাহাড়ি ঐতিহ্যবাহী নাগামিজ খাবার আর পোশাক্ল পরিচ্ছদের পশরা সাজানো। আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল ‘একাশিয়া’ নামে স্থানীয় একটি তিনতারা হোটেলে। আমরা হোটেলে গিয়ে দুপুরের স্নান্নখাওয়া সেরে বিকেল পাঁচটায় এলাম অনুষ্ঠানস্থলে সাউন্ড ব্যালান্স চেক করতে। ততক্ষণে দর্শনার্থীদের আগমন শুরু হয়ে গেছে। যেদিকে তাকাই সরলমতি খেটেখাওয়া প্ৠগৈতিহাসিক পাহাড়ি মানুষের মুখ। অনুষ্ঠানে আমার আমন্ত্রণ ছিল গজল শিল্পী হিসেবে।

বাংলাদেশের ও নাগাল্যান্ডের মধ্যে শীতের তেমন তারতম্য অনুভূত হল না। খোলা আকাশের নিচে বিশাল বড় একটি আলোকোজ্জ্বল মঞ্চ। মঞ্চে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু করতালিতে মুখরিত হল চারিদিক। আমি মঞ্চে বসে দুই দেশের সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বললাম, দুই দেশের মধ্যেকার খাবার, পোশাক্লপরি চ্ছদ, ভাষা, এমনকি মুখের গড়নে খুব সাদৃশ্য রয়েছে। আমার কথা শুনে সবাই আনন্দবোধ করলেন ও করতালি দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করলেন। তারপর সংগীত পরিবেশন শুরু করলাম। শ্রোতৃ দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে চতুর্দিক মুখরিত হল। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানশেষে জানতে পারলাম, ডিমাপুরের গভর্নর সামনের দর্শকসারিতে বসে আমার গান শুনেছেন। অনুষ্ঠানের আয়োজক ও কর্মকর্তাদের কয়েকজন তো আবেগে কেঁদেই ফেললেন আমাকে জড়িয়ে ধরে। নাগাল্যান্ডের লোক্লসং স্কৃতি প্রদর্শন করতে য়েসব লোকশিল্পী এসেছিলেন তাঁদের প্রাণঢালা ভালবাসা আর অভিনন্দন পেয়ে গর্বে আমার বুক ভরে উঠল। মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম আমার বাংলামায়ের মুখ। আরো একবার বুঝলাম, জানলাম– সুর ও বাণীর মালা দিয়ে কিভাবে কত সহজে ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষকে কত আপন করা যায় আর তাঁদের আপন হওয়া যায়। মঞ্চ থেকে নামার পর তাঁদের সামনে যাচ্ছিলাম, সবাই আমার প্রতি করজোড়ে তাদের সম্মান, ভালবাসা আর অভিবাদন প্রদর্শন করছিলেন। সত্যিই এ এক স্বর্গীয় অনুভূতি, এমন অনুভূতি জীবনে বার বার আসে না।

নাগাল্যান্ডের সৌন্দর্যের কথা আর কি বলব? অপার্থিব, অলোকসামান্য। সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হল সেখানকার মানুষ। সহজ সরল অনুভূতিসম্পন্ন পরিশ্রমী মানুষগুলি প্রকৃতি তার মহাকালের ঐতিহ্য বুকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে। সুযোগ হল ডিমাপুরের বাঁশ গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শনের; সেখানে গিয়ে বাঁশের তৈরি বিভিন্ন প্রকার মনোহারি ড়্গুদ্র ও কুটির শিল্পকর্ম দেখার। সময়স্বল্পতার কারণে কোহিমাতে যাওয়া হল না।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানশেষে দেখলাম পাঁচটি দেশের আমন্ত্রিত শিল্পীরাই আমার গান শুনেছেন এবং আমি তাদের প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়েছি। ভাল লাগল ডিমাপুরের স্টোনপার্ক ধানসিড়ি নদী দেখে। আসার সময় কলকাতার উদ্দেশে ডিমাপুর বিমান বন্দরে ঢুকছি, অবাক হয়ে দেখলাম, বিমান বন্দরের প্রতিটি কর্মকর্তা আমাকে চেনেন! পাসপোর্ট বইয়ে আমার নাম দেখে নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার প্রতি চেয়ে হঠাৎ ‘স্যারজি বহোত বহোত প্রণাম! আপকা গানা হাম সবকো ইতনা আনন্দ দিয়ে কে কেয়া কহে, সবকা দিল কো ছুঁ লিয়া’– এরচেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে একজন সংগীতশিল্পীর জীবনে! অনেক ভালবাসা আশীর্বাদ শুভকামনা আর দেশের জন্য সুনাম নিয়ে ফিরে এলাম। আর নিয়ে এলাম চির অমলিন উজ্জ্বল স্মৃতি। ‘মাটি কে রং’ আমার মনের ক্যানভাসে জীবন্ত ছবি হয়ে রইল। আইজিসিসিকে অশেষ ধন্যবাদ।

অলোককুমার সেন সংগীতশিল্পী

প্রশিক্ষণ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার ২০১৪১৫ অর্থ বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশনআইটিইসি) কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৮টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩৬ মা সের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫৪৫ বছ রের মধ্যে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আবেদনকারীরা কর্মরত সংস্থার সুপারিশপত্রসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকায় পাঠাবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:-

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000

http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন:
fscom@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme for the year 2014-15. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 48 reputed Institutions across India. They are typically short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 years' relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

The applicants should forward their applications to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications. The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000

http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.

Any queries may be addressed to
fscom@hcidhaka.gov.in

প্রবন্ধ

রবীন্দ্র-সত্যজিৎ মেলবন্ধন

আফরোজা পারভীন

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম ১৯২১ সালের ২ মে, মৃত্যু ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুবরণ করেন ১৯৪১ সালে। সেই হিসেবে তিনি যখন মারা যান সত্যজিৎ রায় তখন ১৯ বছরের যুবক। তবে রায়ের পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। সত্যজিতের পিতা ও পিতামহ দু'জনই ছিলেন নামকরা শিল্পী। পিতামহের একটি ছাপাখানাও ছিল। সেখানে তিনি মুদ্রাকরের কাজ করতেন। তিনি ছোটদের জন্য একটা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সত্যজিতের লেখা ও ছবি সে কাগজে বের হত। সত্যজিতের পিতা সুকুমার রায়ও একজন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। তাঁর মজার ছড়া পড়েনি এমন শিশু খুঁজে কঠিন। সত্যজিতের বয়স তখন দুই, তার পিতা সুকুমার রায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে গেলে তরুণ বন্ধুটির অনুরোধে তিনি নিজের লেখা কয়েকটি গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। সত্যজিতের মা সুপ্রভা দেবীও খুব ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। বাবা-মায়ের সঙ্গে শিশুবয়সে সত্যজিৎ একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে দেখতে। কবিগুরু তখন সত্যজিতের খাতায় একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। এতেই তাঁদের সম্পর্কের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। ১৯ বছর বয়সে মায়ের এবং কবিগুরুর আগ্রহে সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনে যোগ দেন চিত্রকলা বিভাগে। কবির বয়স তখন প্রায় আশি। সত্যজিৎ চিত্রকলা শেখার পাশাপাশি কবির উপন্যাসগুলি পড়েন, তাঁর নাটকের অভিনয় দেখেন, তাঁকে নানা দিক থেকে জানার চেষ্টা করেন। ১৯৪১ সালে কবির মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরই সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে আসেন নিজেকে তৈরি করবার অভিপ্রায়ে, নিজের শেকড়ের সন্ধানে। তিনি ঘুরতে থাকেন পুরো ভারতবর্ষ।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গভীর মানবতাবাদী। তাঁর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান– সবকিছুতেই প্রকাশ পেয়েছে মানবপ্রেম। সত্যজিৎও ছিলেন গভীর মানবদরদী। তাঁর এই দরদ ছিল ভালবাসায় সিক্ত। এ প্রসঙ্গে পথের পাঁচালীর কথা বলা যায়। পথের পাঁচালীতে দুর্গার বিরুদ্ধে একটি পুঁতির হার চুরির অভিযোগ আনা হয়েছিল। অপু সেই হারটা দেখতে পেল। দুর্গা তখন মৃত। অপু হারটা তাদের বাড়িসংলগ্ন পুকুরে ফেলে দিল। পানা এসে আবার জায়গাটা ভরে দিল। পুকুরে ঠাঁই পেল অপুর গোপন কথা।

একজন মানুষ একসঙ্গে কত রকমের প্রতিভা ধারণ করতে পারে, এবং সে প্রতিভাকে পূর্ণরূপে বিকশিত করতে পারে রবীন্দ্রনাথ তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রোত্তরকালে আরেকটি মানুষ রবীন্দ্রনাথের মতই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি সত্যজিৎ রায়। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রকলা, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ। শেষ জীবনে তিনি পিতামহ প্রতিষ্ঠিত *সন্দেশ* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছিলেন। ছিলেন জনপ্রিয় লেখক। প্রতিবছর পুজো সংখ্যায় তার কোননা- কোন উপন্যাস প্রকাশিত হত। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট প্রচ্ছদ আঁকিয়ে। তাঁর সৃষ্ট দুটি মুদ্রাক্ষরের আদল (টাইপ ফেস) ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। এই ফেস দুটির নাম 'রে রোমান' ও 'রে বিজারে।' মজার ব্যাপার হচ্ছে, সত্যজিৎ রায় কখনই আনুষ্ঠানিকভাবে কোন চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেননি অথচ তিনি নিজেই চলচ্চিত্রের এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে সংশিষ্ট সব প্রক্রিয়া যেমন চিত্রনাট্য, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, সঙ্গীত, দৃশ্যসজ্জা ও পরিচালনা তিনি নিজে করতেন। একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয় অনেক মানুষের যৌথ প্রচেষ্টায়। তাঁদের সবার সব বিষয়ে সমান পারদর্শিতা থাকে না। তাই কোন একটি জায়গায় কিছু ঘাটতি থাকলে সার্বিক নির্মাণকাজে ঘাটতি থেকে যায়। এ বিষয়ে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার 'আভা গার্দ' মতবাদের অন্যতম পুরোধা আবেল গাঁসএর উক্তি বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'মনে একটা চলচ্চিত্র রূপ নেওয়া আর তার বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে যেন ভোলটেজ শতকরা কুড়ি ভাগ কমে যায়।' তাই সত্যজিৎ প্রায় সমুদয় কাজ নিজেই করতেন। তার অর্থবল কম ছিল, টিম ছিল ছোট কিন্তু স্থায়ী। তিনি তাঁর ছায়াছবির প্রতিটি খুঁটিনাটি নিজেই দেখতেন।

১৯৪৫ সালে সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের চিত্রনাট্য তৈরি করেন কিন্তু তখন ছবিটি নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। এর প্রায় ৪০ বছর পর তিনি নতুন করে চিত্রনাট্য তৈরি করেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে তিনি তাঁর তিনটি ছোটগল্প অবলম্বনে *তিনকন্যা* নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। একই বছর তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নির্মাণ করেন তথ্যচিত্র *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*। ১৯৬৪ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' ছোটগল্প অবলম্বনে তৈরি করেন *চারুলতা*। তবে এ ছবি তৈরি করতে গিয়ে তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখেন।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সততা, নান্দনিকতা আর নৈতিকতা– যা রবীন্দ্রনাথের লেখারও প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়গুলি সত্যজিৎ তাঁর চলচ্চিত্রে আরোপ করেছেন গভীর নিষ্ঠায়। হেনরি মিকলি ১৯৮১ সালে সত্যজিতের চলচ্চিত্র সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'তাঁর ছায়াছবিগুলির চিত্রভাষা থেকেই বোঝা যায়, তার কাছে চলচ্চিত্র নৈতিকতার বিষয়। তারা প্রকাশ করে হারানো পবিত্রতার জন্য স্মৃতিমেদুর ব্যাকুলতা, যে পবিত্রতা শিল্প প্রকাশের মুহূর্তেই ফিরিয়ে আনতে পারে কলকাতাবাসী। এই মহান শিল্পী যে প্রাথমিকভাবে একজন মহান নীতিবাদী, এ সত্য নজর এড়াবে কি করে?' রবীন্দ্রনাথের মত সত্যজিৎও বিশ্বাস করতেন, শিল্পীর কাজ হয় তার শিল্পের মাধ্যমে। গান্ধীজী একবার রবীন্দ্রনাথকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে বললে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আপনি সুতো কাটেন, আমি কথার জাল বুনি– যার যা কাজ।' রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু তাঁর নিজের কাজ নিয়ে থেকেছেন। অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হননি। সত্যজিৎও গভীর নিষ্ঠায় তাঁর কাজটি করে গেছেন। কেউ তাকে প্রলোভিত করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গভীর মানবতাবাদী। তাঁর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান– সবকিছুতেই প্রকাশ পেয়েছে মানবপ্রেম। সত্যজিৎও ছিলেন গভীর মানবদরদী। তাঁর এই দরদ ছিল ভালবাসায় সিক্ত। এ প্রসঙ্গে *পথের পাঁচালী*র কথা বলা যায়। *পথের পাঁচালী*তে দুর্গার বিরুদ্ধে একটি পুঁতির হার চুরির অভিযোগ আনা হয়েছিল। অপু সেই হারটা দেখতে পেল। দুর্গা তখন মৃত। অপু হারটা তাদের বাড়িসংলগ্ন পুকুরে ফেলে দিল। পুকুরটি ছিল পানায় ভর্তি। হার ফেলায় পানা সরে গিয়ে টুপ করে হারটি পড়ে গেল। পানা এসে আবার জায়গাটা ভরে দিল। পুকুরে ঠাঁই পেল অপুর গোপন কথা। অপু বিষয়টা কাউকে জানাল না, আলোচনা করল না, দোষী সাব্যস্ত করল না, নিন্দা করল না। সে ক্ষমা ভালবাসা আর দরদের সঙ্গে হারটা ছুঁড়ে দিল পুকুরে। সত্যজিতের ভাষায় আনুগত্য, ড্রামা আর ভালবাসা জীবনকে একসূত্রে গেঁথে রাখে।

আগেই বলেছি ছবির সব কাজ সত্যজিৎ নিজেই করতেন। *তিন কন্যা* থেকে সত্যজিৎ তাঁর চলচ্চিত্রের সঙ্গীত নিজেই রচনা করতেন। *চারুলতা*র পর থেকে তিনি প্রায়ই

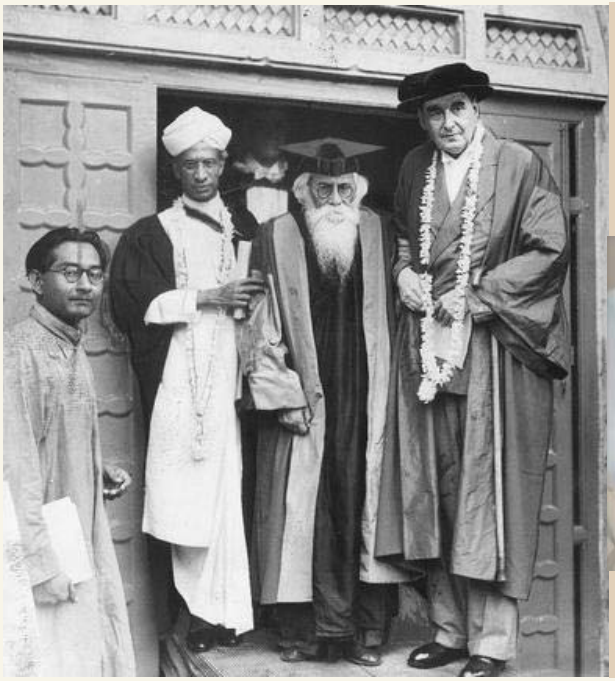

মৃত্যুর একবছর আগে ১৯৪০ সালের ৭ আগস্ট অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির কনভোকেশনের পর শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে রবীন্দ্রনাথ, মরিস গেয়ার ও সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ

জীবনের অন্তিমলগ্নে 'অস্কার' ট্রফি হাতে সত্যজিৎ রায়

ক্যামেরার কাজ নিজেই করতেন। সিনেমার স্ক্রিপ্ট নিজেই লিখতেন। অনেক চিত্রনাট্য তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। এর মধ্যে রয়েছে ছয়টি কাহিনিচিত্র, পাঁচটি তথ্যচিত্র এবং দুটি ছোট ছায়াছবি।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র জীবন ছিল ব্যতিক্রমী। সত্যজিৎ তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রের জন্য 'কান ফিল্ম উৎসব' থেকে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন ১৯৫৬ সালে। ফরাসিরা তাঁকে দিয়েছিল 'লিজন ডি অনার' সম্মান আর ১৯৯২ সালে হলিউড তাঁকে 'অস্কার' সম্মানে ভূষিত করে। এ ছাড়াও তিনি লাভ করেন অসংখ্য পুরস্কার। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সবচেয়ে বড় পুরস্কার 'নোবেল' লাভ করেন ১৯১৩ সালে। তবে কোন নোবেল বা অস্কার দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বা সত্যজিৎকে মূল্যায়ন করা যায় না। তাঁদের যে কীর্তি সে কীর্তির মূল্যায়ন কোন পুরস্কারে হয় না। সে মূল্যায়ন হয় মানুষের ভালবাসায়। সে ভালবাসা তাঁরা পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সত্যজিতের ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। এই শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায় সত্যজিৎ নির্মিত তথ্যচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'এর প্রারম্ভিক মন্তব্যে– '১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট তারিখে কলকাতা শহরে একজন মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত হয়েছে। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকার কোন আগুনে পুড়বে না। সে উত্তরাধিকার শব্দের, সঙ্গীতের, কবিতার, মননের, আদর্শের। তাঁর শক্তি আমাদের বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে অভিভূত করবে, অনুপ্রাণিত করবে। আমরা তাঁর কাছে বহু গুণে ঋণী। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই।'

সত্যজিতের অনুরাগী ভক্ত চলচ্চিত্র বোদ্ধা গাস্ত রোবের্জ তার 'সত্যজিৎ রায়' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে যে কথা লিখেছিলেন সেই একই কথা লেখেন। তবে তারিখটি লেখেন ১৯৪১ এর ৭ আগস্টের স্থলে ১৯৯২ এর ২৩ এপ্রিল। তিনি পুরো মন্তব্যটি তুলে দিয়ে পরিশেষে লেখেন, 'এই কথা ক'টি (তারিখটি ছাড়া) সত্যজিৎ রায়ের লেখা, তাঁর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রস্তাবনা হিসেবে। আশা করি, তারিখটি বদলে কথাগুলি যদি আমি সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে আমার গ্রন্থের প্রস্তাবনায় ব্যবহার করি, তা ধৃষ্টতা বলে গণ্য হবে না। তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের নাম দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমি আমার বইয়ের নাম দিলাম– 'সত্যজিৎ রায়।' তাঁর ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের সব দিক নিয়ে চর্চা করতে আমার অক্ষমতা বিষয়ে আমি অবহিত।'

সাহিত্য আর চলচ্চিত্রের দুই বিজয়ী নাবিক সম্পর্কে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি– যাঁরা বাংলা সাহিত্য আর চলচ্চিত্রকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন।

আফরোজা পারভীন কথাকার

সত্যজিৎ তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রের জন্য 'কান ফিল্ম উৎসব' থেকে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন ১৯৫৬ সালে। ফরাসিরা তাঁকে দিয়েছিল 'লিজন ডি অনার' সম্মান আর ১৯৯২ সালে হলিউড তাঁকে 'অস্কার' সম্মানে ভূষিত করে। এ ছাড়াও তিনি লাভ করেন অসংখ্য পুরস্কার। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সবচেয়ে বড় পুরস্কার 'নোবেল' লাভ করেন ১৯১৩ সালে। তবে কোন নোবেল বা অস্কার দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বা সত্যজিৎকে মূল্যায়ন করা যায় না। তাঁদের যে কীর্তি সে কীর্তির মূল্যায়ন কোন পুরস্কারে হয় না। সে মূল্যায়ন হয় মানুষের ভালবাসায়। সে ভালবাসা তাঁরা পেয়েছেন।

রাজশেখর বসু

মো. সফিকুল ইসলাম

বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙালি সাহিত্যিক, অনুবাদক, রসায়নবিদ ও অভিধান প্রণেতা রাজশেখর বসুর জন্ম ১৮৮০ সালের ১৬ মার্চ বর্ধমান জেলার বামুনপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস ছিল নদীয়া জেলার বীরনগর (উলা) গ্রামে। তাঁর পিতা দার্শনিক পণ্ডিত চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন দ্বারভাঙ্গা রাজএ স্টেটের ম্যানেজার। মা লক্ষ্মীমণি দেবী। রাজশেখর ছিলেন পিতৃমাতার ৬ স ন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়। *পরশুরাম* ছদ্মনামে ব্যঙ্গকৌতুক ও বিদ্রুপাত্মক গল্পরচনার জন্য বিখ্যাত রাজশেখর প্রথম জীবনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যালে কর্মরত ছিলেন। গল্পরচনা ছাড়াও ধ্রুপদী ভারতীয় সাহিত্য অনুবাদ করে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জনকারী রাজশেখর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার ও পদ্মভূষণ সম্মান লাভ করেন।

দ্বারভাঙ্গায় শৈশবকাল কাটায় তিনি বাংলার তুলনায় হিন্দি ভাষায় অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯৭ সালে পাটনা কলেজ থেকে এফ এ এবং ১৮৯৯ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বি এ পাশ করেন। ১৯০০ সালে এম এসসি কোর্স চালু হওয়ায় রসায়নে এম এ পরীক্ষা দিয়ে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯০২ সালে রিপন কলেজ থেকে বি এল পাশ করে মাত্র তিনদিন আইন ব্যবসায় করেছিলেন। আইনের পরিবর্তে বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করার লক্ষ্যে তিনি আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ১৯০৩ সালে আচায রায়ের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসএ রসায়নবিদ হি সেবে যোগ দেন। স্বীয় দক্ষতায় অচিরেই তিনি প্রফুল্লচন্দ্র ও তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. কার্তিক বসুর প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। একবছরের মধ্যেই তিনি ঐ কোম্পানির পরিচালক পদে উন্নীত হন। একদিকে গবেষণার কাজ, অন্যদিকে ব্যবসায় পরিচালনা– উভয়ক্ষেত্রেই তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। কেমিস্ট্রি ও ফিজিওলজির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে তিনি এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। স্বাস্থ্যহানির দরুণ ১৯৩২ সালে এখান থেকে অবসর নিলেও উপদেষ্টা এবং পরিচালকরূপে আমৃত্যু তিনি এই কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খল অভ্যাসের জন্য তাঁর জীবনযাপনপ্র্ণালী কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হলে তিনি তাতে সক্রিয় অংশ নেন।

অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে সাহিত্যজীবন শুরু করেন রাজশেখর। ১৯২২ সালে *পরশুরাম* ছদ্মনামে তিনি একটি মাসিক পত্রিকায় 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে ব্যঙ্গরচনা প্রকাশ করেন, যা তাঁকে প্রভূত জনপ্রিয়তা প্রদান করেছিল। এরপর আরো অনেকগুলো রসরচনামূলক গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেন। গল্প ছাড়াও তাঁর স্বনামে প্রকাশিত কালিদাসের মেঘদূত, বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ), কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকৃত মহাভারত (সারানুবাদ), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি ধ্রুপদী ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদগ্রন্থ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় রাজশেখর বসুর প্রবাদপ্রতিম বাংলা অভিধানগ্রন্থ *চলন্তিকা*। এগুলি ছাড়াও তিনি *লঘুগুরু, বিচিন্তা, ভারতের খনিজ, কুটির শিল্প* শিরোনামে প্রবন্ধগ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২১।

১৯৫৫ সালে *কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প*গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত করে। *আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প* বইটির জন্য তিনি ১৯৫৬ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসং স্কার সমিতি ও ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সংসদের সভাপতিত্বও করেন রাজশেখর। ১৯৫৭৫৮ সা লে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তাঁকে ডি লিট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতেও সম্মানিত করে। ১৯৪০ সালে জগত্তারিণী পদক এবং ১৯৫৫ সালে সরোজিনী পদকেও ভূষিত হন রাজশেখর। বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তাঁর দুটি ছোটগল্পের চলচ্চিত্ররূপ দেন। সেগুলো হল– *পরশপাথর* এবং 'বিরিঞ্চি বাবা' অবলম্বনে *মহাপুরুষ*।

এফ এ পাশ করার পর রাজশেখর শ্যামাচরণ দেের পৌত্রী মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বসু দম্পতির এক কন্যা ছিল। তাঁর মেয়ের জামাই খুব অল্প বয়সে অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করলে শোকে কাতর মেয়েও একই দিনে মারা যান। ১৯৪২ সালে তাঁর স্ত্রীও পরলোকগমন করেন। এরপর ১৮বছর স্ত্রীবি য়োগজনিত সময়কালে তিনি সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৯ সালে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েও লেখালেখি চালিয়ে যান। অবশেষে ১৯৬০ সালের ২৭ এপ্রিল দ্বিতীয়বার স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন বাংলা সাহিত্যের এই অসামান্য হাস্যরসিক জীবনশিল্পী।

মো. সফিকুল ইসলাম
সংস্কৃতিকর্মী

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

বাড়ি ৩৫, রোড ২৪
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

বাড়ি ২৪, সড়ক ২
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫

সাল ২০১৫
সময়কাল সন্ধ্যা ৬.৩০

৭ মার্চ সৌরভকুমার নাহারের সঙ্গীতানুষ্ঠান

৬১৩ মার্চ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে
প্রাঙ্গণে মোর আয়োজিত *দুই বাংলার নাট্যমেলা*

১৪ মার্চ আইজিসিসির ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে *সৃষ্টি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র* ও *নৃত্যাঞ্চল*এর *বাঁদী-বান্দার রূপকথা*-র উদ্বোধন করছেন সংস্কৃতিমন্ত্রী

২০ মার্চ সংস্কৃতি সচিব ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, এনডিসির আবৃত্তিসন্ধ্যা

২১ মার্চ শেখ জসিম উদ্দিন কবিরের গজল সন্ধ্যা

৩১ মার্চ কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারে কলকাতার *মঞ্জিরএর স্বাধীনতা সংগ্রাম* গীতিনৃত্যালেখ্যর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার সন্দীপ চক্রবর্তী

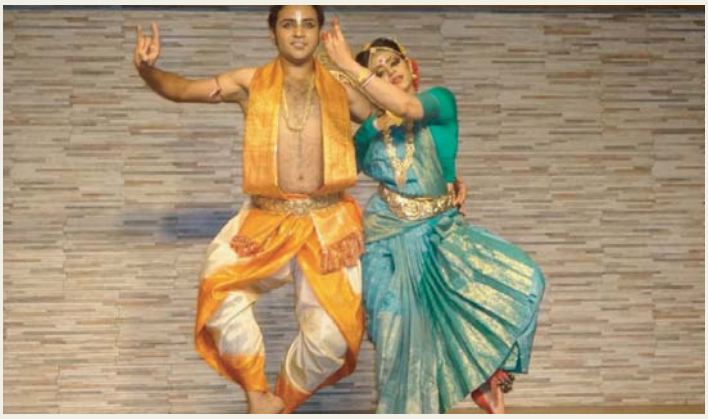

৪ এপ্রিল রাচেল প্রিয়াংকা পেরিসের নৃত্যসন্ধ্যা

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra April 2015

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ঢাকার ধানমন্ডিতে নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ১জানুয়ারি, ২০১৫ বৃহস্পতিবার থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকায় একটি নতুন আইভিএসি সুবিধাদানের ঘোষণা দিচ্ছে।

ঠিকানা

আইভিএসি কেন্দ্র, বাড়ি ২৪, সড়ক ২, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।
আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্র বিদ্যমান। এগুলি হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা (নতুন) ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী।
ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

০১.০১.২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে:
১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

০১.০১.২০১৫ থেকে বিশেষভাবে কার্যকর, আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

মেডিক্যাল ভিসা

আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে একটি বিশেষ মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা কাউন্টার রয়েছে। ই-টোকেন ছাড়াও আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯
০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত